ঘরপোড়া গোরু এবং



মনোজ দাশ







অপরিণামদর্শী, সর্বনাশের পথে দ্রুত ধাবমান জাতিকে জাগাতে
ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ-বেদনা-আবেগের এক আশ্চর্য বর্ণমালা

ঘরপোড়া গোরু এবং

মনোজ দাশ

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা—৭০০ ০৭৩

Gharpora Garu Ebong

(A Political Satire)

by

Manoj Das

প্রথম প্রকাশ :

জানুয়ারি ২০১৭

বর্ণ সংস্থাপক :

লেজার পয়েন্ট

২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট,

কলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক :

ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১১এ গড়পার রোড

কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক :

শ্রী অরুণ ঘোষ

বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা—৭০০ ০৭৩

মূল্য : ৩০.০০ টাকা

ঘরপোড়া গোরুর ইতিকথা

'ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘে ভয় পায়'—বাংলা ভাষায় এক সুপরিচিত প্রবাদ। গাঁ-ঘরের জীবনযাত্রার সঙ্গে যাদের পরিচয় আছে, তারা জানেন প্রবাদটি তৈরির পিছনের কাহিনী। যাদের পরিচয় নেই—তারা অবশ্য জানেন না সেই কাহিনী। নগরায়নের এই যুগে জানাটা সম্ভবও নয় হয়তো। তো তাঁদের জন্য জানানো যাক প্রবাদটার জন্মবৃত্তান্ত।

মশার কামড় থেকে গোরু বাঁচাতে গ্রামের গেরস্তরা সন্ধে রাত্তিরে গোয়ালে আগুন জ্বালায়। এক বিশেষ ধরনের আগুন। যেখানে আগুন থাকে ভিতরে, বাইরে থাকে ধোঁয়া। ঘুঁটে বা কাঠকুটো দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে তার ওপর নরম-ভেজা নাড়াপল চাপিয়ে দিলে শাসন মানে আগুন, বাড়বাড়ন্ত হয় ধোঁয়ার। সেই ধোঁয়ার ঘূর্ণি ভরে থাকে গোয়ালঘর, মশার পাল পালায়। মশা তাড়াতে জ্বালানো হয় এই যে আগুন, এর নাম সাঁজাল। সম্ভবত, সাঁঝবেলার আলো বলে সাঁজাল নাম। অন্তত উত্তর-দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিস্তৃত অঞ্চলে এই নামই আছে তার।

তা এহেন সাঁজালের বুকে নিভুনিভু হয়ে নিরীহ অবস্থান যে আগুনের, সে যে সবসময় নিরীহ থাকে, তা নয়। কখনো সখনো রকমসকম পাল্টে জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে। গেরস্তের নজরে পড়লে রক্ষে, এক বালতি জল পড়লে আগুন আবার লক্ষ্মী ছেলে। আবার ধিকিধিকি। আবার ধোঁয়া। কিন্তু নজর না পড়লে? সমূহ বিপদ। গোয়ালঘরের নীচু চাল, গোয়ালঘরের বেড়া, গোয়ালঘরের পাশে জমিয়ে রাখা কাঠকুটো, শুকনো ঘুঁটের পাহাড় ধরে ফেলতে দেরি করে না। আর একবার সেসব ধরে ফেললে গোরুবাছুরের নিশ্চিন্ত আশ্রয়টা হয়ে ওঠে জতুগৃহ। সেই জতুগৃহে অসহায়ের মত পুড়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না খুঁটোয় বাঁধা প্রাণীগুলির।

তবু এখানেও কিছু ব্যতিক্রম থাকে। কপালজোরে আগুন যদি খুঁটোর সঙ্গে বাঁধা দড়িটিকে আগে পোড়ায়, তখন বাঁধনছাড়া গোরু সবেগে পালায় গোয়ালঘরের জতুগৃহ থেকে। পালায় বটে, তবে সুস্থদেহে নয়। কেননা, আগুনে তার শরীরের লোম পুড়ে যায়, লোমের নীচের চামড়া পুড়ে যায়। এইসব গোরু বেঁচে থাকে 'ঘরপোড়া' নাম নিয়ে। সাঁজালের আগুন এদের প্রাণটি ছিনিয়ে নিতে পারেনি বটে, কিন্তু এদের মনে সারাজীবনের জন্য ভয়াবহ এক স্মৃতি রেখে দেয়। এমনই সেই স্মৃতি যে, পরবর্তী জীবনে লাল রঙ্ দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ে তারা। শেষ বিকেলের সিঁদুর রাঙা মেঘ দেখলেও তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ভাবে, এই বুঝি সেই আগুন-লাগা ভয়ংকর দিনটি ফিরে এল। এই বুঝি যায় প্রাণ। আলোচ্য প্রবাদটিতে ঘরপোড়া গোরুর এই মানসিক অবস্থার কথা, আশংকার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু প্রবাদবচন তো শুধু কয়েকটা শব্দ মাত্র নয়, একটা সাধারণ বিবৃতি মাত্র তো নয়। প্রবাদ মাত্রই যমক-শ্লেষ। সামনে এক, ভিতরে আর এক। বহিরঙ্গে এক, অন্তরঙ্গে আর এক। প্রবাদ হল অভিজ্ঞতার নির্যাস। সহজ কথায়, সহজ ভাষায় জীবনের সত্যকে-জীবনের অভিজ্ঞতাকে মানুষের সামনে তুলে ধরার, মানুষকে সতর্ক করার, মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করার পন্থাই হল প্রবাদ। লোকশিক্ষার জন্যই জন্ম হয়েছে তার। ঘরপোড়া গোরুর এই প্রবাদটির মধ্য দিয়ে তাহলে কি কোনও আশংকার কথা বলেছেন প্রবাদকার? প্রবাদটিকে ব্যবহার করে কি বলতে চাওয়া হয়েছে কিছু? এই পুস্তিকাতে এবার যাব সেই প্রসঙ্গে। বলব, প্রবাদের পশ্চাতের গূঢ় তত্ত্ব। বলব, গোরুর সঙ্গে 'এবং' টি কে বা কারা। তবে তার আগে গোরু বিষয়ে দু-চারটে সাধারণ কথা এবং বঙ্গদেশের মনুষ্য গোরুকে কোন্ চোখে দ্যাখে, সেই বিষয়ে দুচার কথা বলে নেওয়া দরকার। তা না করলে 'এবং' দের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টা পরিষ্কার হবে না। গোরুর পরিচয় দেয়ার পর দেব 'তেনাদের' পরিচয়—যাদের হারিয়ে 'ঘরপোড়া গোরুরা' অধিকতর বুদ্ধিমান বা তুলনায় 'উত্তম' প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবী রাখে। প্রথমে আসি গোরুর কথায়।

গোরু একটি নিরীহ, বোকাসোকা প্রাণী। চতুষ্পদ প্রাণিকূলে বুদ্ধিহীনতার মাপকাঠিতে সে সবার আগে। বুদ্ধিহীন বলেই নিজের দুধকে মানুষের সেবায় নিঃশেষে দান করে। শুধু দুধ নয়, মানুষকে তার মলমূত্রও দিয়েছে ব্যবহারের জন্য। গোরু যতদিন বেঁচে থাকে, নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে যায় মানুষের। ফসলের জন্য জমি কর্ষণ করা, ফসল উঠলে তা মাড়াই করা, গ্রামীণ জীবনে পরিবহন ব্যবস্থাকে সচল রাখা—সব কাজেই গোরু। তার এই নিঃশব্দ সেবা পরায়ণতার জন্য নিজেকে সর্ব অর্থে মানবসেবায় উৎসর্গ করার এহেন অবদানের জন্য ভারত রাষ্ট্রের বহু প্রদেশের মানুষ বিশেষ করে উত্তর ভারতের হিন্দুরা গোরুকে বলে গোমাতা। তবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের একটা বড় অংশ—বিশেষ করে সাম্যবাদী, প্রগতিবাদী ও উদারবাদীরা—গোদুগ্ধের সঙ্গে গোমাংসেরও ভক্ত। অবশ্য এদের সবাই যে গোরু খায়, তা নয়। তবে ধর্মনিরপেক্ষতা জাহির করার জন্য গোরুখেকোদের ঘোরতর সমর্থন করে বলেই এদের পরিচিতি গোমাংসের ভক্ত হিসেবে। গোরুকে গোমাতা আখ্যা দিয়েছে যে উত্তর ভারত, সেই অঞ্চল এদের কাছে পরিচিত 'গোবলয়' হিসেবে। কারণে-অকারণে ব্যবহারও করে থাকে কথাটি। বাঙালি জাত্যাভিমান দেখাবার জন্য। তবু মন্দের ভাল, বঙ্গদেশের ট্রেড্ মার্ক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের পরিচয়ে এরা বাংলাকে 'ব্যাঘ্রবলয়' বলেনি। বললে, মহা হাসির ব্যাপার হত।

বুদ্ধিহীনতার বিচারে বাঙালির মুখে দুটি চতুষ্পদ প্রাণীর নাম আখছার উঠে আসে। গোরু এবং গাধা। বোকা বোঝাতে এই নামদুটো সবার আগে। তবু এখানেও কিন্তু গোরুর উল্লেখ বেশি। ঘটে বুদ্ধি নেই বোঝাতে বাঙালি বলে 'গোবর-ভরা

মাথা'। গাধার মল নিয়ে এব্যাপারে টানাটানি হয়েছে, আমাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা সে কথা বলেনা। সুতরাং গাধার দাবীকে সরিয়ে রেখে বিশ্বের নির্বোধতম চতুষ্পদ প্রাণী হিসেবে আমরা যদি গোরুকে মনোনীত করি ভুল হয়না বোধহয়। বাঙালি মানসিকতার সঙ্গে সাযুজ্যটাও থাকে।

তা এহেন প্রাণীটিকে শিরোনামে বসিয়ে আমরা কী বলতে চাইছি? 'এবং' বলতেই বা বলছি কাদের কথা? এবার যাব সেই প্রসঙ্গে।

আগেই বলেছি, প্রবাদবচন কয়েকটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত সহজবোধ্য একটি বাক্যমাত্র নয়। তার বহিরঙ্গে একটি অর্থ থাকে, অন্তরঙ্গে আর এক। প্রত্যক্ষে নায়ক একজন, পরোক্ষে অন্যজন। 'ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘে ভয় পায়'-এর মধ্য দিয়ে প্রবাদকার যে কথাটি বলতে চাইলেন সেটি হল : বাপু হে, একবার যদি ঘর পোড়ে, তবে সাবধান থেকো ভবিষ্যতে। সতর্ক থেকো, আর যেন ঘর না পোড়ে। আর সেজন্যে আগুন দেখতে পাও আর না-ই পাও, লাল রং থেকে দূরে থেকো। কারণ, ভাগ্যের জোরে আধপোড়া হয়ে একবার বেঁচেছো বটে, কিন্তু বারবার বাঁচবে না।

বাস্তব জীবনে আমাদের এই দেশে ঘরপোড়া হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে মুখ্যত দুটো জাতের। বাঙালির আর পাঞ্জাবীর। এই পুস্তিকাতে আমরা টানব বাঙালিকে। তার কারণ, প্রবাদটি বাংলা ভাষায় লেখা এবং প্রবাদকারের লক্ষ্য যে বাঙালি ছিল, সেটা বোঝাও দুরূহ নয়। আরও একটা কথা। পাঞ্জাবের লোকগণনা বা আদম সুমারিতে সিঁদুরে মেঘ জাতীয় কোনও লক্ষণ আদৌ দেখা যাচ্ছে না, এবং যেভাবে চলছে তাতে আগামী অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে দেখা যাবেও না। অতএব ঘরপোড়া গোরুর সঙ্গে একাসনে আমরা যদি বাঙালিকে দাঁড় করিয়ে দিই, আশা করি কারও আপত্তির কারণ হবে না। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির বিষয়ই হল এটা।

বাস্তবে ঘরপোড়ার নিদারুণ অভিজ্ঞতা বড় যন্ত্রণার সঙ্গে অর্জন হয়েছে বাঙালির। অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই আগুনে স্বজন হারানোর, স্বভূমি হারানোর, দেশান্তরী হওয়ার। কেমন ছিল সেই আগুন, কেমনভাবে ফিরে আসছে আবার সেই আগুন, বলব সেই কথা। কিন্তু তারও আগে ঘরপোড়া গোরুর সঙ্গে তুলনা হয়েছে যার, সেই বাঙালি জাতি বলতে কাদের বোঝায়—সেটা বলতে হয়।

বাঙালির ইতিকথা

বাঙালি কে? অভিধানমতে, বঙ্গদেশের বাংলাভাষী অধিবাসীদের বলা হয় বাঙালি। এর মানে বাংলায় বাস করলেই যে সে বাঙালি হবে, তা নয়। বাংলায় বাস এবং বাংলা যার মাতৃভাষা—সেই হল বাঙালি। আর এই কারণে কয়েক পুরুষ ধরে বাংলায় বসবাস করছে এবং বাংলা ভাষায় বাক্যালাপে স্বচ্ছন্দ এমন বহু মাড়োয়ারিকে বাঙালি বলা যায় না। কারণ, তাদের মাতৃভাষা বাংলা নয়। আবার বাংলায় মূল ছিল একদা, এমন বহু বঙ্গসন্তান দীর্ঘকাল ধরে বিদেশে বাস করলেও তারা বাঙালি।

বাঙালি বটে, তবে প্রবাসী বাঙালি। মার্ক্স সাহেব যতই ধর্মের সমালোচনা করুন না কেন, যতই রিলিজিয়নকে আফিম বলে বর্ণনা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনিও খ্রিস্টমতে সমাহিত হয়েছিলেন। ইংরেজ এত বড় জাতি—মুক্তচিন্তার এত বড় ধারক-বাহন—তারও একটা ধর্ম আছে। খ্রীস্ট ধর্ম। বাঙালির ধর্ম কী? হিন্দু। কেউ ফোঁস করে উঠতে পরেন—ইসলাম নয় কেন? বাংলায় বসবাসরত ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মাতৃভাষা যদি বাংলা হয়, তবে অভিধানের নির্দেশ অনুসারে বাংলার মুসলিম জনতাকেও তো বাঙালি বলতে হয়। ন্যায্য কথা, কিন্তু অভিধানের কথা বাস্তবে কি সর্বদা মান্য হয়? রবি ঠাকুর যখন 'বাংলার মাটি বাংলার জল' লিখছেন—যখন লিখছেন "বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান"।

কিংবা তার পরে যখন আরও প্রার্থনা করছেন—

"বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান"।

তখন কি তিনি বাঙালির মধ্যে মুসলমানদের ধরেছিলেন? যদি ধরে থাকেন, তবে একবারের জন্য অন্তত 'ভগবান' না লিখে 'আল্লাজান' কেন লিখলেন না? তিনি কি তাহলে বাঙালি বলতে শুধু হিন্দুদের ধরেছেন?

বিষয়টি নিয়ে এতদিন মাথা ঘামাননি কোনও পণ্ডিত। সম্প্রতি ঘামাচ্ছেন, মানে ঘামাতে বাধ্য হচ্ছেন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোটেশান প্রীতি' বহুখ্যাত। কলকাতার রাস্তায় ফাঁকা জায়গা পেলেই রবি ঠাকুর আর কাজী নজরুলের কবিতা-গানের দু চার লাইন ঝুলিয়ে দ্যান। সম্প্রতি রবি ঠাকুরের 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটির মধ্যিখানের কয়েকটা লাইন তিনি পথিপার্শ্বে বড় মনোরম ভঙ্গিতে, বড় যত্ন করে ঝুলিয়েছেন। সেখানে সব ঠিক আছে, বাদ গেছে 'হে ভগবান' কথাটি। কেন বাদ? মমতা দেবীর রাজনীতি সম্পর্কে যাদের কিঞ্চিৎ ধারণা আছে, তাঁরা জানেন, এই বাদ যাওয়াটা স্লিপ অফ পেন্ নয়, ভাবনা চিন্তা করেই রবি ঠাকুরের লেখায় সামান্য একটু সম্পাদনা মাত্র। সম্পাদনার প্রয়োজনটা এই কারণে—কেন 'ভগবান' লিখবেন রবীন্দ্রনাথ? ভগবান হিন্দুর সম্পত্তি। মুসলমানরা কিকরে হিঁদুর পুতুলের নাম নেবে? তাই ঝামেলার জায়গাটা দে কেটে!

তিনি কাটলেন, কিন্তু মাথায় বোমা ফাটল আমাদের মত আম বাঙালির। ঠিক জায়গাটায় কোপ মেরেছেন তো দিদি! হোন্ না তিনি রবীন্দ্রনাথ, তাতে কী? সত্যি বলতে কি, এতদিনে বুঝলাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাঙালি জাতির মধ্যে বাংলার মুসলমানদের ধরা হয়নি। তাঁর কবিতায় গানে বাঙালি মানে বাংলার হিন্দু। সেজন্যেই এই কবিতায় 'আল্লাজান' লেখার কথাটা ভাবেননি পর্যন্ত।

প্রসঙ্গত খেয়াল হল, রবিঠাকুরের কবিতায় কলম চালিয়ে 'ভগবান'-কে কেটেছেন বটে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, কিন্তু এখনও পর্যন্ত 'আল্লাজান' জুড়ে দেওয়ার

হিম্মতটা জুটিয়ে উঠতে পারেন নি। ওপার—মানে, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ মৌলবাদীরা কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের কবিতায় এরকম অস্ত্রোপচার ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। নজরুলের 'চল চল চল ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল' গানের একটি পংক্তি—'নব নবীনের গাহিয়া গান সজীব করিব মহাশ্মশান' অস্ত্রোপচারের পর হয়েছে মহাশ্মশানের জায়গায় 'গোরস্তান'। হিঁদু দেবদেবী নিয়ে নজরুল যেখানে ভক্তি টক্তি দেখিয়েছেন, কোপ পড়েছে সেখানেও। দে গোরুর গা ধুইয়ে।

এরকম হিন্দু-দোষ সেকালের আরও অনেক বিখ্যাত লেখকের লেখায় পাওয়া যাবে। শরৎবাবু তাঁর 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের এক্কেবারে গোড়ায় লিখছেন—'ইস্কুলের মাঠে বাঙ্গালী ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ।' এই মুসলমান ছাত্ররা কি রাজাবাজার বা পার্ক সার্কাসের বিহারী মুসলমান ঘরের ছেলে? তা নয়। তারা ওই পাড়াগাঁয়েরই মুসলমান পাড়ার মুসলমান ঘরের ছেলে। তাহলে কেন শরৎবাবু লিখলেন না—'ইস্কুলের মাঠে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের ফুটবল ম্যাচ'? লিখলেন না এই কারণে যে, তিনি জানতেন বাঙালি এবং হিন্দু সমার্থক। বাঙালি মানে হিন্দু এবং বাংলার হিন্দু মানেই বাঙালি। বিচারটা ঠিক না ভুল-সে প্রশ্ন নিরর্থক। সাধারণ ধারণাটাই বললাম কেবল। ছন্দের যাদুকর সত্যেন দত্ত মশাইয়ের 'আমরা বাঙালি' কবিতার শৌর্যময় বাঙালি তাই একেবারে আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু সন্তান। আবার উল্টোদিকে পণ্ডিত লেখক নীরদ সি. চৌধুরির 'আত্মঘাতী বাঙালি'র হতমান বাঙালিও একান্তভাবে হিন্দু।

অত বছর আগের কথায়ই বা যাই কেন? এই একালেও, মানে এই ঘোরতর ধর্মনিরপেক্ষতার যুগেও আমাদের অনেকের মুখ থেকেই খুব স্বাভাবিক ভাবে বেরিয়ে আসে—অমুক ছেলেটা বাঙালি নয়, মুসলমান। মুসলমানরা বাঙালি নয়, বাঙালি হতে পারে না—এই ধারণাটা এত শক্ত শিকড় জমাল কিভাবে? মাতৃভাষা বাংলা এবং বঙ্গদেশে বসবাস করে যে বিপুল জনগোষ্ঠী—ধর্মীয় পরিচয়ে তারা মুখ্যত হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অভিধানগত অর্থ ধরলে হিন্দুরা যেমন বাঙালি, মুসলমানরাও তেমনই বাঙালি। কিন্তু অভিধানের বাইরেও আরও কিছু বিষয় থাকে। অন্তত মুসলমানদের ক্ষেত্রে। যা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের জাতিপরিচয়কে, জাতিসত্তাকে। বাঙালিত্বের আলোচনায় সেই প্রসঙ্গ অবধারিত ভাবে উঠে আসবেই।

১৮৭২ সালে ভারতে প্রথম আদমসুমারি করে ইংরেজ। পুরো ভারতে নয়, কিছু কিছু প্রদেশে। যে প্রদেশগুলিতে হয় এই সুমারি, বাংলা (তৎকালীন অভিভক্ত বাংলা) ছিল তাদের অন্যতম। সেই সুমারির রিপোর্টে জানা যায়, বাংলার হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা তখন প্রায় সমান সমান। কিন্তু পরবর্তী সমস্ত আদমসুমারিতে হিন্দুরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকল। পিছোতে পিছোতে ১৯৪৭ সালে দেশভাগ যখন হল, তখন হিন্দুরা অবিভক্ত বাংলার মোট জনসংখ্যার ২৮ ভাগ, আর মুসলমানরা ৭০ ভাগ।

এই জন্যেই সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে জিন্নাহ্ এবং সোরাওয়ার্দি চেয়েছিলেন পুরো বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করতে। এবং জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভারতের কমিউনিস্টরা প্রত্যক্ষভাবে, এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটা গোষ্ঠী পরোক্ষভাবে সেই দাবীর সমর্থনে দাঁড়িয়েও ছিলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জেদ এবং অনড় অবস্থানের জন্য শেষ পর্যন্ত বাংলার পূর্ব প্রদেশের বৃহত্তর অংশটি সংখ্যাগুরু মুসলমানদের দিয়ে এবং পশ্চিমাংশ সংখ্যালঘু হিন্দুদের দিয়ে ভাগ করা হল বাংলাকে। স্বাধীনতা এল। ওপার বাংলা হল পূর্ব পাকিস্তান, এপার বাংলা পশ্চিমবঙ্গ। ভারতের অঙ্গরাজ্য।

ধর্মের ভিত্তিতে এই যে বিভক্ত করা হল বাংলাকে তথা ভারতকে—এই দাবীটা কাদের ছিল? উত্তরটা জানতে ইতিহাস পড়ার দরকার হয় না। দাবী তুলেছিল মুস্লিম লীগ। বলেছিল, হিন্দু এবং মুসলমান দুটি আলাদা জাতি। এরা একসঙ্গে থাকতে পারে না। মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ চাই। এটাই হল দ্বিজাতিতত্ত্ব। রাজনৈতিক দল হিসেবে এই দাবীকে প্রথম সমর্থন করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এটা জানতে অবশ্য কিঞ্চিৎ পড়াশোনা করতে হবে। কারণ, কমিউনিস্টরা এবং তাদের স্কুলের মাষ্টারমশায়রা সেদিনের সব তথ্যকে এমনভাবে ঢেকেঢুকে রেখে দিয়েছেন, যাতে কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ যথাসম্ভব কম দিতে হয়। অবশ্য তা সত্ত্বেও যদি কেউ জেনে ফেলে এবং প্রশ্ন করে—তখন 'ভুল করেছি' বলে হাত তুলে দাঁড়ালেই সাতখুন মাফ। আর ভুল স্বীকারে ভারতের কমিউনিস্টরা বিশ্বে বিরলতম প্রজাতি—এটা নতুন কথা নয়। বাঙালি হিন্দুরা বাংলা ভাগ চেয়েছিল একেবারে অন্তিমে। ১৯৪৬ -এর আগস্ট মাসের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ধ্বনি মুখরিত কলকাতা দাঙ্গা এবং তারপর অক্টোবর মাসের নোয়াখালি গণহত্যার পর। তার আগে পর্যন্ত হিন্দু নেতারা ভেবেছিলেন একসঙ্গে থাকতে পারবে হিন্দু এবং মুসলমান।

এই দুই গণহত্যা শ্যামাপ্রসাদ সহ অন্য হিন্দু নেতাদের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছিল। তখনই তাঁরা দাবী করেছিলেন ভারত ভাগ হলে বাংলা ভাগ করতে হবে। জেলা ভিত্তিক ও ধর্ম ভিত্তিক। সেই দাবী মানতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ। তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গ।

পশ্চিমবঙ্গের এই জন্মবৃত্তান্তটি ইতিহাসের পাতা থেকে সযত্নে নিবাসিত করেছে প্রথম জমানার কংগ্রেস সরকার এবং পরের জমানার কমিউনিস্টরা। তারা শ্যামাপ্রসাদকে দাগিয়ে দিলেন বাংলার বিভাজনকারী হিসেবে, হিন্দু সাম্প্রাদায়িক নেতা হিসেবে। মজার কথা হচ্ছে, পূর্ব বাংলায় জন্ম নেয়া বেশিরভাগ কমিউনিস্ট নেতা এবং তাদের পোষ্য ইতিহাসবিদরা ধর্মনিরপেক্ষতার গান গাইবার জন্য কিন্তু ওপার বাংলায় থাকেননি। 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' বলতে বলতে দেশভাগ হতে না হতে পাততাড়ি গুটিয়ে পালিয়ে এসেছেন সাম্প্রদায়িক শ্যামাপ্রসাদের লড়াইয়ের ফলে পাওয়া পশ্চিমবঙ্গে। এবং তারপরও এইসব মহাশয়রা কী লজ্জাহীন দেখুন,

এখানে এসে ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন হিন্দুদের বিরোধিতায় এবং মুসলমানদের তোষণের রাজনীতিতে। কারণ বিপ্লব ততদিনে ঠাঁই নিয়েছে ভোটের বাক্সে এবং সেই বাক্সের দখল নিতে মুসলমান ভোট বড় আশ্রয়। কী মহান সেকুলার নেতাগণ! আহা!

ফিরে আসি মুসলমানরা বাঙালি কিনা সেই প্রসঙ্গটিতে। প্রথমে বাংলাদেশের মুসলমানরা বাঙালি কিনা—দেখা যাক সেই কথাটি। কারণ আলাদা রাষ্ট্র হলেও অবিভক্ত বাংলার মানুষ তারা। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে তাঁরা নিজেরাই ত্যাগ করেছেন বাঙালি পরিচয়। হয়েছেন বাংলাদেশী। কাছাকাটি বটে, তবু আম আর আমড়া কি এক? সুতরাং বাদ দেওয়াইতো বাঞ্ছনীয়। তবু যাদের মন খুঁতখুঁত করবে, তাদের জন্য দু-চার কথা বলা যাক। স্কুল-কলেজ-ইউনির্ভাসিটিতে আমার বেশ কিছু মুসলমান বন্ধু ছিল এবং এখনও আছে কয়েকজন। বসিরহাট শহরে আজ থেকে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে 'মতিদার চায়ের দোকান' নামে একটা দোকানে বসে সাহিত্য যশপিপাসু আমরা কয়েকজন তুমুল চর্চায় মেতে উঠতাম।

সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি দেশ বিশ্ব মহাবিশ্ব হেন বিষয় ছিল না যা উঠত না সেই আলোচনায়। দোকান মালিক মতি দা ছিলেন রসিক মানুষ, খদ্দের ছেড়েছুড়ে হাজির হতেন বৈঠকে। কয়েকজন মুসলিম বন্ধুও নিয়মিত আসতেন সেই আড্ডায়।

পশ্চিমবাংলার ভূগোল সম্পর্কে নাতিবিস্তর পরিচিত যারা, তাঁরা জানেন উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার (তখন অবশ্য ভাগ হয়নি জেলাটি) এই মহকুমা শহরটি সীমান্তের কাছাকাছি। পাশে ইছামতী নদী, নদী পেরিয়ে মাত্র কয়েক মাইল এগিয়ে গেলে বাংলাদেশের সীমানা। স্থল সীমান্ত। নাম ঘোজাডাঙা বর্ডার।

বাংলাদেশ যুক্তিযুদ্ধের সময় বসিরহাট ও সন্নিহিত টাকী শহর দুটি উদ্বাস্তুতে ভরে গিয়েছিল। বসিরহাটের যেখানেই খালি জায়গা পেয়েছে উদ্বাস্তুরা, পলিথিন শিট্ টাঙিয়ে সেখানেই আস্তানা গেড়েছে। সরকারি অফিসের বারান্দায়, রাস্তার পাশে রাখা সিমেন্টের বড় বড় পাইপের মধ্যে—সর্বত্র উদ্বাস্তু। টাকীতেও সেই একই অবস্থা। পরের দিকে অবশ্য টাকীর পাশের বিশাল এক বাগান—সৈন্যের বাগান—সেখানে উদ্বাস্তুদের জন্য তাঁবু তৈরি করে দেয় সরকার। হাজার হাজার তাঁবু। খাবার দাবার চিকিৎসারও ব্যবস্থা হয়। ১৯৭০-এ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এসেছিলেন একবার এই শিবির পরিদর্শনে।

কিছুটা কৌতূহল আর একটা জনসেবার তাগিদ—এই দুইয়ের কারণে বেশ কয়েকদিন এই উদ্বাস্তু শিবিরে গেছি। জানতে চেয়েছি, মানুষদের নাম, পরিচয়। প্রথমে ধারণা ছিল আমাদের, পাকিস্তানের খান সেনাদের অত্যাচার থেকে বাঁচতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাংলাদেশের মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছেন ভারতে। (এই প্রচার ওপার বাংলার মানুষ এখনও করেন) কিন্তু মানুষের পরিচয় শুনে

আমাদের ভ্রম কাটল। এক শ' জনের মধে এক শ' জনই হিন্দু! একটিও মুসলমান নেই! প্রসঙ্গত, জানিয়ে রাখি, একটি শিবিরের পরিসংখ্যান দিয়ে কোনও সামগ্রিক সিদ্ধান্তে আসাটা অনুচিত। হয়তো মুসলমানদের মধ্যেও কেউ কেউ খান সেনার অত্যাচার থেকে বাঁচতে পালিয়ে এসেছিলেন এদেশে। তাঁরা কিন্তু সাধারণ পরিবারের মুসলমান নন। তাঁদের হয় যোগাযোগ ছিল মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগের সাথে অথবা, তাঁরা শিক্ষক-অধ্যাপক-কবি-লেখক-ডাক্তার-ইঞ্জিনীয়ার এইসব শ্রেণীর মানুষ। উচ্চ সামাজিক অবস্থার কারণে তাঁরা খানসেনাদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত করেছিলেন নিজেদের। পালিয়ে এসেছিলেন সেইজন্য। এই সব মানুষরা শিবিরে থাকতেন না, ঘর-বাড়ি ভাড়া করে অথবা আত্মীয়জনের বাড়িতে অথবা হোটেলে থাকতেন। চাকরিসূত্রে আমি কয়েক বছর পরে বর্দ্ধমানের পারবীরহাটায় থাকি। আমার পাড়ায় থাকতেন মুক্তিযুদ্ধের এক বড় নাম—আবদুল কাদ্দের সিদ্দিকী, সাধারণের কাছে, বাঘা সিদ্দিকী।

যাই হোক, উদ্বাস্তদের মধ্যে মুসলমানদের এই অনুপস্থিতি মাঝে মধ্যেই আমাদের চায়ে-পে-চর্চার আলোচনায় বিষয় হয়ে উঠত। সাধারণ মত ছিল, মুসলমানরা খানসেনাদের বিরুদ্ধে নয়, মুসলমানরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নয়। কারণ?

মুসলমানদের প্রথম ও শেষ পরিচয় মুসলমান। এই পরিচয়ের কাছে বাকী পরিচয় গৌণ। ব্যতিক্রম থাকতেই পারে এবং আছেও, তবে তাকে ব্যতিক্রমের বেশি বলা যায় না। অতএব বাংলা ভাষার জন্য বা বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের সংগ্রামের যে কাহিনী জোর কদমে প্রচার হত (এখনও হয়), তা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটাই কাল্পনিক। তখনকার খবরের কাগজে মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকরা বন্দুক-রাইফেল নিয়ে লড়াই করছে বলে যেসব ছবি বেরোত, বোঝাই যেত সাজিয়ে গুছিয়ে তোলা হয়েছে সেসব ছবি। কাঁচা অভিনেতা, কাঁচা ফটোগ্রাফার। আমাদের হাসি পেত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাংলার মুসলমানরা কোনওদিন বাঙালি জাতীয়তার সপক্ষে কথা বলেনি। ১৯৪৬-এ বলেনি, ১৯৪৭-এ বলেনি, তার পরেও কখনো নয়। অনেকে সেদেশের মুক্তি আন্দোলনের কথা বলেন, জাতীয়তাবাদে তাঁদের ভালবাসার প্রমাণ হিসেবে রবিঠাকুরের রচিত জাতীয় সঙ্গীতের কথা বলেন। বলেন— জাতীয়তাবাদী চেতনাই নাকি তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এই রটনার পিছনে কতটা সত্য আর কতটা কল্পনা—তা নির্মোহ গবেষকের গবেষণার বিষয় হতে পারে। কিন্তু গবেষণা না করেও কয়েকটি সাধারণ তথ্য পেশ করা যেতে পারে। প্রথমত, রাষ্ট্রপুঞ্জ দ্বারা প্রকাশিত তথ্য। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় দশ মিলিয়ন বা এক কোটি মানুষ এসেছিল ওপার থেকে। যাদের প্রায় সবাই হিন্দু। তারা এসেছিল গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য (During 1971 Liberation war, around 10 million mostly Hindus,

came to India to escape systematic mass killings, rapes, lootings and arson. Amongst them 1.5 million stayed back.–Wikipedia)। তার মানে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মুসলমান সেদিন তাদের স্বদেশেই ছিল। আর স্বদেশে থেকে খানসেনাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, একথা শুনলে ঘোড়াও হেসে ফেলবে, আপনি হাসবেন না?

তাহলে মুক্তিযুদ্ধ করল কে? নব্বুই হাজার খান সেনাকে বন্দী করল কে? বাংলাদেশ তৈরি করল কে? উত্তরটা আমি না দিলেও চলবে। নিজেই ভেবে নিন না!

দ্বিতীয়ত, ১৯৪৬ থেকে শুরু করে অদ্যাবধি (এবং আগামী দিনেও) হিন্দুদের হত্যা করে, ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে, হিন্দু মেয়েদের অবাধে (এবং নির্ভয়ে) ধর্ষণ করে, জবরদস্তি ধর্মান্তরণ করে দেশটাকে সংখ্যালঘুহীন করার যে বিভীষিকাময় কর্মযজ্ঞ হচ্ছে—তার বিরুদ্ধে ওদেশের সাধারণ মুসলমান, পুলিশ, প্রশাসন, আইন-আদালত এমন নীরব কেন? নীরবতা যে সম্মতির লক্ষণ—সেটা কি বলে বোঝাবার দরকার পড়ে?

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের সংবিধানকে ইসলামী সংবিধানে পরিণত করার বিষয়টি। মুজিবর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান আজ যেভাবে পুরোদস্তুর ধর্মীয় হয়ে পড়েছে, সেটা শুধু জিয়াউর রহমান বা হোসেন মহম্মদ এরশাদ বা খালেদা জিয়াদের সৌজন্যে নয়, তার সঙ্গে মুজিব কন্যারও কিছু অবদান বোধহয় আছে। আবার এটা যে শুধু নেতানেত্রীদের চাওয়ার জন্যই হয়েছে, তাও নয়। সেদেশের মুসলিম জনতা চেয়েছে বলেই বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম। এবং সেদেশের মুসলিম জনতা চেয়েছে বলেই দেশকে হিন্দুমুক্ত করা, মূর্তিপূজকদের বিতাড়নের চেষ্টা। মনে রাখতে হবে, একাত্তরের তথাকথিত জাতীয়তাবোধ—মুজিবর রহমান যার নির্মাতা ছিলেন—সেটা ছিল একটি বুদ্বুদ মাত্র। ফেটে যেতে দেরি হয় নি। এবং তারপর যে কে সেই। বাঙালি বললে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে যাতে তাদের কেউ গুলিয়ে না ফেলে, তাই তারা শুরুতেই ছেঁটে দিল 'বাঙালি' পরিচয়, হল বাংলাদেশী। তাহলে বাঙালির আলোচনায় তাদের নেব কেন?

ওপার বাংলার অর্থাৎ বাংলাদেশের মুসলমানরা নাহয় বাঙালি অভিধার বাইরে থাকল, কিন্তু এপারের বাংলাভাষী মুসলমান? তারা কেন বাঙালি নয়? কারণ, ধর্মীয় সত্তা পেরিয়ে বাঙালি জাতিসত্তায় তারা মিশে যেতে পারেনি। বাংলার বাংলাভাষী মুসলমান বিশ্বের সব মুসলমানের মতো ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্ব ছাড়া অন্য কোনও জাতীয়তাবাদী চিন্তা বা ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাস করে না। সে কারণে পাশের বাড়ির হিন্দুভাই অপেক্ষা সুদূর আরবের মুসলমান ভাই তার বড় প্রিয়। বাংলার ধর্মীয় হানাহানির মূল হল এই ভাবনা। সেইসঙ্গে পবিত্রভূমিকে কাফেরমুক্ত করার কোরান-প্রদত্ত মধ্যযুগীয় নির্দেশ। ব্যতিক্রমী চিন্তা কি নেই মুসলমানদের মধ্যে? হিন্দুর

সঙ্গে আত্মার মেলবন্ধন তৈরি করে', ধর্মকে অতিক্রম করে' বাঙালিত্বকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা ভাবে, এমন মুসলমান কি নেই? অবশ্যই আছে। তবে তার সংখ্যা কোটিতে গুটিক। তবু সংখ্যা যত কম হোক, তাদের বাঙালিত্বের দাবী অন্যায্য নয়। তারা অবশ্যই বাঙালি। আর এইজন্যই গড় মৌলবাদী মুসলমানের শত্রু তারা। হিন্দু যেমন শত্রু, তেমন শত্রু এই 'ধর্মদ্রোহী' ও উদার সংস্কৃতির বাহক মুসলমানরা। আজকের বাংলাদেশে এই মুক্তচিন্তার অধিকারীদের গলাও কাটা পড়ছে হিন্দুর সঙ্গে।

দুটি পক্ষ তাহলে ঠিক হয়ে গেল। একদিকে ঘরপোড়া গোরু, আর একদিকে বাঙালি।

বাঙালির ঘরপোড়ার ইতিবৃত্ত

ঘরপোড়া গোরুর পুড়ে যাওয়ার কাহিনীটা তো প্রথমে বলেছি, এবার বলি, বাঙালির ঘরপোড়ার গল্প। অন্য জাত হলে বলার দরকার ছিল না, বাঙালি বলেই দরকার। কেননা সজল-শ্যামল দেশের অধিবাসী এই জাতটার মন বড় নরম। কাদার ওপর দাগ কাটলে যেমন সেই দাগ স্থায়ী হয় না, অল্পেতেই মুছে যায়, বাঙালিও তেমন। ভুলে যাওয়ার ব্যারামটা বড় বেশি। নইলে খুব বেশি পুরনো দিনের কথা তো নয়, বড় জোর সত্তর বছর আগে শুরু হয়েছে এই ঘরপোড়া হওয়ার ইতিহাস। কিন্তু বাঙালি বেবাক ভুলে মেরে দিয়েছে। আর বাঙালি পণ্ডিতদের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ঢাউস ঢাউস গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছে, নাজি জার্মানির হিটলারের হাতে কত মানুষ মরেছে সেই হিসেব ক্লাসের ফার্স্ট বয়ের মত গড়গড় করে বলে যাবে, অথচ ওপার বাংলায় কত হিন্দু মরল, কত হিন্দু ধর্ম পাল্টাতে বাধ্য হল, কত হিন্দু গায়েব হল—তার কোনও খবর নেই। তার জন্য এই প্রণম্য বুদ্ধিজীবীদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এমনকি, এমন বাঙালিও পাবেন যিনি এসব প্রশ্নকে 'সাম্প্রদায়িক' তক্‌মা দিয়ে উল্টে প্রশ্নকর্তার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়বেন। যদিও সেই মহোদয়ের চোদ্দ পুরুষ টানলে দেখবেন—ঠাকুর্দা ছিলেন ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম অথবা নোয়াখালি অথবা পূর্ব বাংলার কোনও জায়গার বাসিন্দা। দেশভাগের জন্য চলে এসেছেন এপারে।

—বাড়িটা তুলে আনতে পেরেছিলেন?

—তা কীকরে আনব?

—জমিজমা?

—ছেড়েছুড়ে এসেছি।

—পরিবারের মানুষজন?

—মোটামুটি এসেছে সবাই, তবে দুই মেয়ে পথে হারিয়ে গেছে,

—হারিয়ে গেছে? নাকি ওরা তুলে নিয়ে গেছে?

—সাম্প্রদায়িক কথাবার্তা বলবেন না।

—সেকি! সত্যি কথা বলা অপরাধ? বেশ। তা পরিবারের বাদবাকীরা কি পৌঁছুতে পেরেছিলেন এপারে?

—কেন পারবেন না? কষ্ট হয়েছিল বটে, তবে পৌঁছেছিল সবাই। শুধু...

—শুধু?

—সেজ কাকা ছাড়া। ইয়ে মানে...

—খুন হয়েছিল বোধহয়। তাই তো?...আর কোন অঘটন?

—সামান্য একটা। ঠাকুরদার এক ভাই মুসলমান হয়ে যায়। তার পরিবার সমেত। তবে ধর্ম তো ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার। এটা নিয়ে বলার কী আছে? তাই না?

—সে তো অবশ্যই। তবে কিনা ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারটা যদি ঘাড়ের ওপর রামদা ধরে রেখে বাধ্য করার দরুণ হয়ে থাকে, তবে বোধহয়—

ষাট-সত্তর বছর আগে আসা এই যে পরিবারটি, তার কর্তা-কর্ত্রীরা অনেকেই গত হয়েছেন। এখন বেঁচে আছেন তাঁদের নাতিপুতিরা। জিগ্যেস করুন তাদের পুরনো সেই দিনের কথা। বলবে—জানি না তো! কেউ বলবে, জেনে কী লাভ? আবার কেউ এমনও কথা বলবে—আপনি কি মশায় হিন্দুত্বের প্রচার করতে এসেছেন? আর এস এস করেন? বিজেপি করেন?

একদা পূর্ব বাংলা থেকে স্রেফ হিন্দু হওয়ার অপরাধে চোরের মত, তাড়া খাওয়া জানোয়ারের মত কোনওরকমে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে আসা সেইসব মানুষের নাতিপুতিদের যদি পাল্টা জিগ্যেস করেন—হিন্দুত্বের কথা বলা কি অন্যায়? জ্ঞানগর্ভ উত্তর ধেয়ে আসবে আপনার দিকে—ধর্ম মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। ধর্মের হানাহানিতে দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ধর্মের প্রয়োজনটা কী?

যদি জানতে চান, কথাটা কি ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য? ধর্ম যদি অপ্রয়োজনীয় হয়, তাহলে ইসলামকেও তো বাতিল করতে হয়। তাই না? এর জবাব দেওয়ার আগে উদারবাদী নাতিপুতি আশপাশটা একবার জরিপ করে নেবে। দেখে নেবে, ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলাটা প্রাণঘাতী হবে কিনা। নিশ্চিন্ত হলে গলা নামিয়ে উদারবাদী তার মত জাহির করবে। নিশ্চিন্ত না হতে পারলে স্রেফ অন্য প্রসঙ্গে চলে যাবে বা হাওয়া হয়ে যাবে সেখান থেকে। এর মধ্যে দু-চারজন এমন পিস্‌ও পাবেন—যারা এমনও বলে বসতে পারে—আমি ধর্ম মানিনা। আর মানিনা যখন, তখন হিন্দু বা মুসলমান যাই হই না কেন, তাতে ক্ষতি কী?

অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হতেও তাদের আপত্তি নেই। কবি-গায়ক-বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিবিদ মহাপণ্ডিত সুমনের ঘরানার এরা। কালাপাহাড়দের সঙ্গে এই ঘরানার কিছু মিল আছে, কিছু অমিলও। অনুতাপে দগ্ধ হয়ে কালাপাহাড় ফিরে আসতে চেয়েছিল তার পুরনো ধর্মে। সেই অনুতাপটুকু এযুগের এই নব্য কালাপাহাড়দের মধ্যে নেই। অথচ, এদেরই পূর্বপুরুষ শুধু ধর্মের মুখ চেয়ে, নিজেদের আরাধ্য দেবদেবীকে ছাড়তে পারবেন না

বলে, ভিটেমাটি ধনসম্পদে ভরা নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে ভিখিরির মত এদেশে এসেছিলেন। ধর্ম যদি এতই অকিঞ্চিৎকর, তবে সেটা ত্যাগ করে ইসলামকে মেনে নিলেই সব ল্যাঠা চুকে যেত, শুধু ঈশ্বরের নামটুকু ছাড়া আর কিছুই ত্যাগ করতে হত না। অথচ, ঈশ্বরের ওই নামটুকুর জন্য কত মানুষের জীবন গেল, সর্বস্ব গেল।

ধর্ম এখন ফুর্তিসর্বস্ব

ধর্ম নিয়ে এই পাগলপনা তাঁদের একালের নাতিপুতিদের নেই। আর নেই বলেই উদ্বাস্তুদের বুঝদার বংশধররা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। মাথা ঘামায় ধর্মের বাহানায় ফুর্তি মারার জন্যে। চারদিকে পুজোর হুল্লোড় দেখলে মনে হয়, মহিষাসুর বধের আগে মা দুর্গা যদি দু-দশটা ভক্তকেও স্বগ্গে পাঠাতেন, মন্দ হত না।

বিপুল তাণ্ডবে পরিচালিত এইসব পুজো কমিটির বীরপুঙ্গবেরা পুজোর ফুর্তি মারার সময় ঘোর হিন্দু, অন্য সময় হিন্দুরা থাকল না গেল, তাদের বয়ে গেল। মালদা-মুর্শিদাবাদ উত্তর দিনাজপুর নদীয়া-দক্ষিণ চব্বিশপরগণার স্কুলে স্কুলে সরস্বতী পুজো বন্ধ হয়েছে মুসলমানদের চাপে, তার বিরুদ্ধে কাউকে কিছু বলতে শুনেছেন? অথচ, বহু বহু বছর ধরে চলে আসছিল এই পুজো। বন্ধ হওয়ার পর প্রতিবাদ শুনেছেন?

বেশির ভাগই চুপ। শুধু চুপ নয়, গলা তুলে বলবে—ইস্কুলে আবার পুজো আচ্চা কেন? ওটা তো পড়াশোনার জায়গা। পুজো করতে হলে বাড়িতে করো।

এমন ব্যাখ্যা মানতে হলে প্রশ্ন করা যায় অফিসে-কাছারিতে বছর ভোর নমাজ পড়ার জন্য আলাদা ঘর রাখা কেন? অফিস কাছারি কি নমাজ পড়ার জায়গা?

উত্তর পাওয়া যাবে না। উত্তর দেবে না কেউ। শুধু শুনবেন, সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সংখ্যাগুরুর। সংখ্যালঘু যে সংখ্যাগুরু হওয়ার পথে শনৈঃ শনৈঃ বাড়ছে—সেদিকে কারো নজর নেই। ভুল বললাম, নজর আছে। কিন্তু মুসলিমদের ভোট সব হিসেব গোলমাল করে দিয়েছে। মুসলমানদের ভোট একমুখী, যাকে দেবে তাকে ঢেলে দেবে। হিন্দুরা উল্টো পথের পথিক। সূর্যের সাত ঘোড়ার মত সাত দিকে ছোটে তারা। এই জন্যেই ভোটের বাজারে তারা মূল্যহীন। তাদের সত্তর পারসেণ্টকে অপাংক্তেয় করে রেখে মুসলমানদের তিরিশ পার্সেণ্টকে নিয়ে নেতামন্ত্রীদের ঝাপাঝাঁপি। তাদের তোয়াজ করতে ব্যস্ত শাসক। তারা অন্যায় করলেও সরকারের মুখে রা নেই, পুলিশ অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে।

অনেক গ্রামে হিন্দু বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় শাঁখ বাজানো বন্ধ হয়েছে—আজানে যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য। কাউকে প্রতিবাদ করতে শুনেছেন? পুরুলিয়ায় তিন শ' ঘর হিন্দুর গ্রাম কাংলাপাহাড়িতে বিশ ঘর মুসলমান গত তিন বছর ধরে দুর্গা পূজা করতে দিচ্ছে না—তার জন্য কোনও বীরপুঙ্গব তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে? নদীয়ায় নাম সংকীর্তনের মিছিলে মুসলমানরা আক্রমণ করেছে—কজন রেখেছেন সেই খবর?

শুধু বীরপুঙ্গবদের কথা বলি কেন! হিন্দুদের শতেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে। মঠ-মিশন-সংঘ-আশ্রম-আরও কত নাম। আর আছেন গুচ্ছের বাবা-মহারাজ-আনন্দ পরমানন্দ-সদাচারী ব্রহ্মচারী। তাঁরা কী করেন? নিজের নিজের ডেরার সুদৃশ্য চার দেওয়ালের মধ্যে ঘি-মাখন খেয়ে শুয়ে বসে দিব্যজ্ঞানের চর্চাতে দিন কাটান। একদলের কাছে শিব প্রধান দেবতা, তো আর একদলের কাছে কৃষ্ণ। আবার একদল কৃষ্ণকে রমণীমোহন বলে গালি দিয়ে কালীকে মাথায় তুলছে। তেত্রিশ কোটি দেবদেবী যে হিন্দুর কতবড় দুর্দশার মূল, তা কেউ ভেবেছি কখনো? এক এক দেবতা বা দেবীর এক একটা ভক্ত গোষ্ঠী। কোনওটা ছোট, কোনওটা বড়। আর এই গোষ্ঠীগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে লাঠালাঠি করছে। এ বলছে আমার দেবতা বড়, ও বলছে ওর দেবতা। মাফিয়া গোষ্ঠীগুলি যেমন একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অনেকটা তেমন। তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বাবাঠাকুরদের দল। এঁরা বীমা কোম্পানির এজেন্টের মত। এদের না ধরলে নাকি ঈশ্বরপ্রাপ্তি হবে না। এজেন্টের যেমন সাব-এজেন্ট থাকে, এনাদেরও আছে ভক্ত কূল। এক ভক্ত বলছে তার বাবাটি ভগবান কৃষ্ণের অবতার, তো আর এক ভক্ত বলছে তার বাবাটিতে শিবঠাকুরের অংশ আছে। সার দিন সারা রাত এইসব নিয়ে চুলচেরা বিচার হচ্ছে। বিচার ছেড়ে একে অপরকে লাঠিপেটা করছে। আর তাদের এই লাঠালাঠিতে শ্মশানের চিতায় উঠছে হিন্দুধর্ম। মুসলমানরা যখন মারছে হিন্দুদের, এরা তখন ঘরের কোণে বিশ্রাম নিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ একটা চমৎকার গল্প বলেছেন—"ভারতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী আর তারা অত্যন্ত গোঁড়া, শৈবরা আর একটি দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়। তাদের মধ্যে ঘন্টাকর্ণ নামক এক ভক্তের গল্প প্রচলিত আছে। সে শিবের এমন গোঁড়া ভক্ত ছিল যে, অপর দেবতার নাম কানে শুনবে না। পাছে অপর দেবতার নাম শুনতে হয়, সেই ভয়ে সে দুই কানে দুই ঘন্টা বেঁধে রাখত। শিব তার প্রগাঢ় ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভাবলেন, শিব ও বিষ্ণুতে যে কোন প্রভেদ নেই, তা একে বুঝিয়ে দেবেন। সেইজন্য তিনি তার কাছে অর্ধ শিব অর্ধ বিষ্ণু অর্থাৎ হরিহর মূর্তিতে আবির্ভূত হলেন। সেইসময় ঘন্টাকর্ণ তাঁকে আরতি করছিল। কিন্তু তার এমন গোঁড়ামি যে, যখন সে দেখল ধূপ-ধূনার গন্ধ বিষ্ণুর নাকেও যাচ্ছে, তখন বিষ্ণু যাতে সেই সুগন্ধ উপভোগ করতে না পান, তজ্জন্য তাঁর নাক চেপে ধরল।"

(স্বামীজির হিন্দুরাষ্ট্রচিন্তা : প্রকাশক—বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র : পৃষ্ঠা—১৩৯)

'ব্রহ্মচারী সিদ্ধেশ্বর রায় বনাম পশ্চিমবঙ্গ সরকার' মামলার রায়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট 'হিন্দু কে?' এই প্রশ্নের উত্তরে সাতটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছে। তার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্যটি হল : Acceptance of the Vedas with reverence as the highest authority in religious and philosophic matters and acceptance with reverence of Vedas by Hindu thinkers and philosophers as the

sole foundation of Hindu philosophy. অর্থাৎ বেদ হল হিন্দুদের সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ এবং বেদে উল্লেখিত বিচারই হল হিন্দুত্বের একমাত্র ভিত্তি। বেদে কোটি কোটি দেবতার নামগন্ধ নেই, কিন্তু আমরা আমাদের সুবিধামত নতুন নতুন ঈশ্বর-ঈশ্বরী তৈরি করে নিয়েছি, এক একটা ঘেটোয় তাঁদের আটকে রেখেছি, আর সেই ঘেটোর মধ্যে থেকে একজন আর একজনকে আক্রমণ করে যাচ্ছি। এর মধ্যে ঈশ্বর সাধনা বলে কি কিছু আছে কোথাও? হিন্দুত্ব বলে কিছু আছে? শত-সহস্র শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত এই ঘেটোমার্কা হিন্দুত্ব কোন্ অতলের অন্ধকারে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভাবলে ভয় হয়। স্বামীজির প্রতিষ্ঠিত মিশনের সন্ন্যাসী মহারাজারা স্বামীজির হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কিত চিন্তাধারা ভুলে গিয়ে এখন ব্যস্ত কেবলমাত্র সমাজসেবা নিয়ে। হিন্দু গেল না থাকল তাতে তাঁদের কিছুই যায় আসেনা। পশ্চিমবঙ্গ হল মিশনের সবচেয়ে বড় কর্মক্ষেত্র, বলা যায় তাঁদের সাধনপীঠ। এই পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা আজ বিপদের সম্মুখীন, অস্তিত্বের সংকট ঘনিয়ে আসছে ক্রমশ। এর বিরুদ্ধে একটা কথাও কি উচ্চারণ করেছে এই প্রতিষ্ঠান? একই কথা বলব ভারত সেবাশ্রম সংঘ সম্পর্কে। দেশভাগের সময় সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ লোকলস্কর নিয়ে, লাঠিসোটা নিয়ে নৌকাযোগে ঘুরে বেড়াতেন পূর্ব বাংলার গ্রামে গ্রামে। মুসলমান আক্রমণের হাত থেকে হিন্দুদের বাঁচাবার জন্য। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেই সংঘ এখন তাদের বিশেষ উৎসবে টিপু সুলতান মসজিদের ঘোর মৌলবাদী ইমাম বরকতিকে আমন্ত্রণ জানায় ভাষণ দেওয়ার জন্য। ভাগ্যের কী পরিহাস!

ভোটবাক্সের রাজনীতি

হিন্দুর জন্য, বাঙালির জন্য শ্যামাপ্রসাদ তৈরি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ। ভেবেছিলেন, হিন্দুর নিজস্ব ভূমিতে শান্তিতে না হোক স্বস্তিতে যেন থাকতে পারে হিন্দু। পশ্চিববাংলার প্রথম দিকের সরকার গুলো পারুক না পারুক স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টাটা করেছিল। তখন পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দুরা এসেছিল দলে দলে, কিন্তু মুসলমানরা আসেনি। যে মুসলমানরা এদেশে থেকে গিয়েছিল তারাও শান্ত সংযত হয়ে থাকার দিকে মন দিয়েছিল। কংগ্রেস দলকে মুসলমানরা পছন্দ করত এই কারণে যে, এই দলের বদান্যতায় এদেশ ত্যাগ করে তাদের পাকিস্তানে যেতে হয়নি। একালেও যেমন, সেকালেও তেমন—মুসলিম ভোট চিরটা কালই গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে একটাই দলের পক্ষে যায়। এই দলটি ছিল কংগ্রেস। এটা দেখে বাংলার উঠতি রাজনৈতিক শক্তি বামপন্থীরা, বিশেষ করে সি পি আই এম দল নজর দিল মুসলিম ভোটে কংগ্রেসের এই একাধিপত্য ভাঙার দিকে। শুরু হল প্রতিযোগিতামূলক মুসলিম তোষণের রাজনীতি। গাঁ-গঞ্জের গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ইত্যাদি সংগঠনে মুসলিম প্রতিনিধি, প্রধান-সভাপতি-কর্মাধ্যক্ষ ইত্যাদি পদে ব্যাপকভাবে

মুসলিমরা ক্ষমতায় বসল। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলির পঞ্চায়েতে তো তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। দলের ভোটবাক্স মজবুত করতে তারা ওপার থেকে ডেকে আনা শুরু করল নিজেদের বন্ধু ভাই বেরাদরদের। ভাই বেরাদরদের দুপারে দু-সেট সংসার হল। এক সেট বাংলাদেশে, আর এক সেট পশ্চিমবাংলায়। ওপারের সম্পত্তি বাপ-ঠাকুর্দার দিয়ে যাওয়া ফিক্সড্ ডিপজিট, এপারের সম্পত্তি নিজেদের উপার্জিত। দুটো দেশ যে আলাদা, বোঝার উপায় নেই। 'ঝাঁপানো পাশপোর্টে, অর্থাৎ বিনা পাশপোর্টে লাফ দিয়ে এপারে চলে আসা, তারপর পঞ্চায়েতের নেতাদের পকেটে কিছু গুঁজে দিয়ে থাকার ব্যবস্থা পাকা করা। রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করা। রেশন কার্ড দফতরের দীর্ঘদিনের মন্ত্রী ছিলেন কলিমুদ্দিন শামস। দরাজ হাতে বাংলাদেশী মুসলমানদের রেশন কার্ড বিতরণ করলেন তিনি। ভোটার লিস্টে নাম তোলাটা তো কোনও ব্যাপারই নয়। কুকুর-বিড়ালের নামও যদি তোলা যায় ভোটার লিস্টে, বাংলাদেশী মুসলমানদের নাম তোলা যাবে না? কোন্ দেশে আছেন মশায়?

২০০৯-থেকে পশ্চিমবাংলায় পরিবর্তনের হাওয়া এল। পরিবর্তন পাকাপাকি হল ২০১১ সালে। সি পি এমের ৩৪ বছরের মসনদ গেল। রাজত্ব গেল বটে, তবে নীতি গেল না। অন্তত মুসলমান তোষণের নীতি। মমতা দেবী এতদিনে সার বুঝে নিয়েছেন। বুঝেছেন, হিন্দুদের মনমতি বড়ই চঞ্চল। হিন্দুমন বড়ই বিলাসী। ধর্ম টর্ম নিয়ে হিন্দুর মাথাব্যথা নেই, হিন্দুর মাথাব্যথা ফুর্তিফার্তা নিয়ে। কিন্তু মুসলমানরা ধর্মভীরু জাত, সুতরাং ধর্ম নিয়ে তাদের সেঁটে রাখতে হবে। তাড়াতাড়ি মুসলমানের মন পাওয়ার আরও একটা জরুরি কারণ ছিল মমতার। এর আগে বিজেপির সঙ্গে কয়েক দফাতে কয়েক বছর ঘর করেছেন তিনি। আর আম মুসলমানের কাছে বিজেপি একেবারে বুনো ওল, অতএব ওল বাদ দিয়ে কোলে ঝোল টানতে গেলে কিছুটা পথ তো বেশি হাঁটতেই হবে। দেখাতে তো হবে, মুসলমানের সবথেকে ভরসার জায়গা তিনি।

আইন-কানুন অতএব চুলোয় তুলে মুসলমানের মন জয়ের রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। ব্যাঙের ছাতার মত যাতে গজিয়ে উঠতে পারে মাদ্রাসা, তার ব্যবস্থা করতে থাকলেন, হাজার হাজার মাদ্রাসার স্বীকৃতি দেওয়া শুরু করলেন। মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানান উপঢৌকনের সূচনা করলেন। হজ যাত্রীদের জন্য অট্টালিকা বানালেন। ইমাম-মুয়াজ্জিনদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় চোলাই মদ খেয়ে মৃতদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশি, সুতরাং তাদের জন্য দুলক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করলেন। মুসলমানদের জন্য আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের (আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়) পত্তন করলেন। আরও যেসব কাজকর্ম করলেন, তার সব কটার উল্লেখ করতে গেলে বেশ কিছু কাগজ ও কলম ব্যয় করতে হবে। তার বোধ হয় তেমন প্রয়োজনও নেই। মোদ্দা ব্যাপার হল,

পশ্চিমবাংলায় বর্তমানে যেন একটাই জাত আছে, আর তার নাম মুসলমান—এই কথাটা বেশ শক্ত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করলেন মমতা দেবী।

আর তার ফলশ্রুতি দেখুন। খবরের কাগজ খুলুন। চুরি-জোচ্চুরি-পকেটমারি-খুন-রাহাজানি-বলাৎকার-ধর্ষণের যেসব ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিদিন—তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাটা একবার গুণে দেখুন। কিভাবে অপরাধজগৎটা তাদের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছে-সেটা দেখুন। দুষ্কৃতীর সংখ্যা মুসলমানদের মধ্যে চিরকালই বেশি, কিন্তু বর্তমানে সেটা লাগামছাড়া। কারণ, ছোটখাট ব্যাপারে মুসলমান দুষ্কৃতীদের হেনস্থা না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। পুলিশও তাই দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছে।

রাজনীতি করতে গিয়ে **সি পি এম মুসলমানদের এনে বসিয়েছিল ড্রইংরুমে আর তৃণমূল কংগ্রেস দল তাদের নিয়ে তুলেছে বেডরুমে।** এইজন্যই মুসলমান দুষ্কৃতীরা আজ এত ভয়হীন, এত বেপরোয়া। দেশভাগের অব্যবহিত পর থেকে যারা 'কী হয় কী হয়' ভেবে দুশ্চিন্তায় ছিল, তারা আজ এতটাই সাহসী যে, পশ্চিমবঙ্গে বসে—কলকাতায় বসে বিজেপির রাজ্যসভাপতি দিলীপ ঘোষকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার শরিয়তি ফতোয়া দিতে ভয় পান না টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম জনাব বরকতি। সাহসটা কোন্ পর্যায়ে গেলে হিন্দুস্থানে বসে এমন ফতোয়া দেওয়া যায় সেটা একবার ভেবে দেখেছেন? এমন নয় যে, বরকতি কিংবা তার ধর্ম নিয়ে কোনও সমালোচনা করেছেন দিলীপ বাবু, তিনি মন্তব্য করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারপর্বে বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীকে কোমরে দড়ি পরিয়ে বেঁধে রাখবেন বলে আস্ফালন করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। আস্ফালনটি যে শালীনতা সম্মত এবং ব্যবহৃত ভাষাটি যে ভদ্রতাবোধের পরিচায়ক—একথা পাকা তৃণমূলী সমর্থক ছাড়া আর কেউ বলবেন না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত নানা সময়ে নানান অছিলায় মমতাদেবী অনেক অকথা কুকথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে। কখনো প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন 'হরিদাস পাল', তো কখনো বলছেন 'তোর বাপের টাকা নাকি যে তুই দিবিনা' (প্রসঙ্গ : একশ দিনের কাজ প্রকল্পে রাজ্যকে টাকা না দিয়ে শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত)! স্বভাবগত ভাবে মুখপাতলা এবং বদরাগী মুখমন্ত্রীর এসব মন্তব্য শুনে আমজনতার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি সমর্থকরাও হেসেছেন, পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন। ক্ষ্যামাঘেন্না করে দিয়েছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতিও স্বতন্ত্র নন। কিন্তু মুশকিলটা বাধল নোট বাতিলের ঘটনার পর। ৮ই নভেম্বর (২০১৬) প্রধানমন্ত্রীর নোটবাতিল ঘোষণার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার সংযমের সব বাঁধ ভাঙল। (খুব একটা যদিও ছিল না কোনকালে) ভাঙার কারণ নিয়ে যে মতটা বাজার বহুল প্রচারিত,

সেটা হল নোটবাতিল হওয়ার ফলে সারদা-নারদা-তোলাবাজি-সিণ্ডিকেট-কমিশনখোরীতে পাওয়া তৃণমূলের কয়েক হাজার কোটি টাকা ডুবে গিয়েছে। সেই যন্ত্রণাতেই নাকি নেত্রীর মাথার ঠিক নেই। সেজন্যই নাকি তাঁর মুখে এত কুকথার ধূম। দিলীপ ঘোষ নিজেও এই কারণের পক্ষে সায় দিয়ে গত কয়েকদিন কিছু কথা বলেছেন। বলেছেন, গোরু যার হারায় সেই জানে গোরু হারানোর দুঃখ। তখন বউকে পর্যন্ত মা ডেকে ফেলে সে।

নোট বাতিল ইস্যু নিয়ে কোনও কিছু করতে বাকী রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী। তিনদিনের আল্টিমেটাম দিয়ে আমৃত্যু লড়াইয়ের শপথ নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গবাসীর খুব ভয় ছিল, আল্টিমেটামের সময়সীমা পেরিয়ে গেলে 'নবান্ন' থেকে ঝাঁপ দেবেন না তো মুখ্যমন্ত্রী! সন্দেহটা বদ্ধমূল হয় যখন টোলপ্লাজায় সেনা মোতায়েনের প্রতিবাদে নবান্নে রাত কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। ভয় হল—এই বুঝি....এটা অবশ্য বেশ কয়েকদিন পরের ঘটনা। তার আগে আল্টিমেটাম পেরিয়ে যেতে তিনি ছুটেছেন দিল্লী। রাষ্ট্রপতির কাছে, সোনিয়ার কাছে, কেজরিওয়ালের কাছে। এমন কি সি পি এমের ইয়েচুরির কাছেও। জনসভা করেছেন। ছুটেছেন লখনউ। দেখা করেছেন যাদবকুলপতি পালোয়ান মুলায়ম সিংয়ের সঙ্গে। সেখানেও জনসভা। ছুটেছেন পাটনা। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আবার নোটবাতিল কাণ্ডের সমর্থক। সেখানে মমতাজীর পাশে পশুখাদ্য ঘোটালার আসামী বিহারের যাদব সম্রাট লালুপ্রসাদ। কিন্তু কোনওখানেই ঠিক জমল না। অন্য কোনও রাজ্য থেকেও ডাক এল না। অতএব কলকাতায় নবান্নে বসে শুরু করেছেন নোটকাণ্ডে মৃতদের সংখ্যা গণনার কাজ। একদিন তাঁর সেনাপতি মুকুল রায় সংখ্যাটা তুলে দিলেন এক শ' পঁচাত্তরে। আবার পরের দিন আর এক লেফ্‌টেনান্ট ডেরেক ও ব্রায়েন জানালেন মৃতের সংখ্যা নব্বুই। কার পরিসংখ্যান ঠিক—ভগবান জানে। যেভাবে চলছে, ক'দিন পরে লোকে আর হার্ট অ্যাটাক ব্রেন অ্যাটাক, ডেঙ্গু, নিউমোনিয়া, ক্যানসারে মরবে না, মরলেই নোট অ্যাটাকে মরেছে বলে ধরে নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

যাই হোক, এহেন ডামাডোলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর বাছা বাছা মন্তব্যে সংযম হারিয়ে দিলীপবাবু এমন একটি মন্তব্য করে ফেলেছেন যা সবার পছন্দ না-ও হতে পারে। দিলীপ বাবু নিজে তার জন্য পরে খেদপ্রকাশও করেছেন। কিন্তু ইমাম বরকতির কী দরকার ছিল আগ বাড়িয়ে বিতর্কে ঝাঁপিয়ে পড়ার? তিনি তো তৃণমূল দলের সদস্য নন। মুখ্যমন্ত্রীর বডিগার্ডও নন। তিনি তো ইমাম। মুসলমানদের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান-খয়রাতি, প্রেম-ভালবাসার প্রতিদানে এমন মোটা দাগের যাত্রাপালার ডায়লগ না দিলেই পারতেন।

হয়তো পারতেন। কিন্তু মমতা রাজত্বে নবলব্ধ ক্ষমতার দম্ভ মৌলবাদীদের মস্তিষ্কে এমন দৃঢ়ভাবে ঢুকে গেছে যে, বরকতি সাহেব নিজেকে সামলাতে পারেননি।

ভেবেছেন, যে মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু সন্তান হয়েও মা দুর্গার বিসর্জন আটকে মহরমের তাজিয়া বের করার হুকুম-জারি করেন, যে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হয়েও তিন তালাককে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন, যে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে হিন্দু দুয়োরানীর ছেলে তিনি মুসলমানের চেয়ে কম কিসে? লালন ফকির গেয়েছিলেন—'বামন চিনি পইতার প্রমাণ, বাম্‌নী চিনি কিসে?' বাম্‌নী চেনা বড় দায়। বরকতি সাহেব কিন্তু ঠিকই চিনেছেন। আর চিনেছেন বলে দিলীপ ঘোষকে শরিয়ত মোতাবেক পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলার হুকুমও জারি করেছেন। খবরে প্রকাশিত যে, দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিম মেদিনীপুর সহ রাজ্যের আরও কিছু জেলায় মামলা দায়ের করেছে। ইমাম বরকতির বিরুদ্ধেও বিজেপির মামলা করা উচিৎ। কিন্তু এব্যাপারে প্রথম মামলাটা করা উচিৎ ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের। নির্দ্বিধায় বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা কখনোই করবে না। কারণ সংখ্যালঘু উন্নয়নের নামে মুসলিম তোষণের যে রাজনীতি ক্ষমতালোভী এই শাসকরা শুরু করেছে—তার ষোল কলা পূর্ণ হতে কিঞ্চিৎ বাকী আছে এখনও, সেই জায়গায় বাংলাকে নিয়ে যেতে গেলে এবং ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দুশূন্য করতে গেলে নেত্রীর হয়ে মুখ খুলতে হয়। ময়দানে নামতে হয়। বোঝাতে হয় যে, আমরা তোমার জন্য হিন্দুস্থানে শরিয়তি বিচার আনতেও পিছুপা হবে না। সেই কারণেই বরকতির এমন সদম্ভ ঘোষণা।

আর আমরা? বাংলার বাঙালিরা এই ঘোষণার পর কী করছি! বরকতি হুংকার ছেড়েছেন ১২ই ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পরের দিনের খবরের কাগজগুলি বরকতি সাহেবের ঘোষণা ছেপেছেন ভিতরের পাতায়। যতটা সাধারণ ভাবে, গুরুত্বহীন ভাবে ছাপা যায় আর কি। 'যুগশঙ্খ'-এর মত একটি দুটি কাগজ অবশ্য খবরটা ছেপেছে প্রথম পাতায়। কিন্তু বাকিরা? বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির জগতের ধারক-বাহক বাজারী পত্রিকাটি তো খবরটি একেবারেই ছাপেনি। যদিও বিজেপি রাজ্য সভাপতির মন্তব্যটি ফলাও করে ছাপার ব্যাপারে কোনও কার্পণ্য করেনি তারা। ভাবলে অবাক লাগে, হিন্দুর জন্য বাংলা ভাগের দাবীর সপক্ষে স্বাধীনতার আগে তৎকালীন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক পত্রিকায় কুপন ছাপিয়ে গণভোট নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর আজকের বাজারী কাগজ? আত্মবিক্রীত ছাড়া কিছু বলা যায়কি? পশ্চিম বাংলার দিকে দিকে ইসলামী মৌলবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে। তাদের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে বাঙালিরা। কিন্তু সেসবের কোনও খবর নেই খবরের কাগজে। কামদুনি কাণ্ডের মত গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটছে চারদিকে—কোনও খবর নেই খবরের কাগজে। আইনের শাসন শাসকের পদদলিত—আর আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মৌন হয়ে বসে আছেন, মৌনতার মাধ্যমে সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন সরকারী প্রসাদের প্রত্যাশায়। এই কাণ্ড শুরু হয়েছে বাম আমল থেকে। এবং সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।

পশ্চিমবাংলা—মৌলবাদীদের অভয়ারণ্য

ইন্টারনেটের সৌজন্যে ওপার বাংলার খবরের কাগজগুলি আজকাল সময় পেলেই পড়ি। তারা কিন্তু এবারের কাগজগুলোর থেকে অনেক সাহসী। নির্দ্বিধায় ছেপে দ্যায় হিন্দুদের ওপর সংঘটিত অত্যাচারের কথা। তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা' উপন্যাসের নাম আমরা জানি। হিন্দুদের ওপর রাষ্ট্রীয় মদতে নেমে আসা ইসলামী সন্ত্রাসের বিবরণ সেখানে। একই গোত্রের লেখা হুমায়ুন আজাদের 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'। কী দুঃসহ অত্যাচার, যন্ত্রণা আর নৃশংসতার শরিক হয়ে ধ্বংসের মুখে সেদেশের হিন্দুরা, সেই বিবরণ পড়লে মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল স্রোত নেমে আসে। বিশ্বের সামনে এই ছবি তুলে ধরার অপরাধে তসলিমা নাসরিন দেশান্তরী। আর হুমায়ুন আজাদ প্রাণ দিয়েছেন মৌলবাদী ঘাতকের হাতে।

মৌলবাদীরা কি আমাদের এই পশ্চিমবাংলায় নেই? না থাকলে খাগড়াগড় কাণ্ড হয় কিভাবে ? মালদার কালিয়াচক কাণ্ড হয় কি করে? কোচবিহারের ঘোক্সাডাঙ্গার হিন্দু পরিবারের ওপর অত্যাচার হয় কিভাবে? আমাদের দেশের খবরের কাগজে এইসব ঘটনার বিবরণ পড়েছেন কখনো? পড়বেন না। না ছাপলে পড়বেন কিভাবে? আমাদের বিখ্যাত সাহিত্যিকদের কারও রচনায় পড়েছেন এমন কোনও ঘটনার বিবরণ? পড়বেন না, কারণ তাঁরা জানেন না যে পশ্চিমবঙ্গে ঘটতে পারে এবং ঘটছে এমন ঘটনা। তাঁরা জানেনই না যে, পাকিস্তানের আই এস আইয়ের মদতে বাংলাদেশ ও ভারতের ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলি 'বৃহত্তর ইসলামী বাংলাদেশ' গঠনের চক্রান্ত ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে। ২০১৩ সালে ভারত সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা এন আই এ (National Investigation Agency) তৎকালীন ইউ পি এ সরকারকে এই ব্যাপারে বিশদ রিপোর্ট করেছিল। খাগড়াগড়-কালিয়াচক ইত্যাদি কাণ্ড এই চক্রান্তেরই অঙ্গ। কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদী দৈনিক ইত্যাদিতে তার কতটুকু খবর পান? আমাদের লেখকদের রচনায় এই ভিতর থেকে শেষ করে দেওয়া ক্ষয়রোগের বিবরণ পান না কেন? অথচ, রাজনৈতিক উপন্যাসের লেখক বাংলায় একেবারে যে কেউ ছিলেন না তা তো নয়। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সহ আরও অনেক লেখক রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছেন। তাহলে বর্তমানের এই খরা কেন?

আমার ধারণা, এর কারণ ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা বা Pseudo secularism—বাংলার তথা ভারতের বর্তমান দুর্দশার জন্য যার দায় সবচেয়ে বেশি। সাদাকে সাদা বললে কেউ যদি আমাকে কালো বলে। কেউ যদি আমাকে সাম্প্রদায়িক বলে দাগিয়ে দেয়—সেই ভয়। আর এই দেগে যাওয়ার ভয় যদি পশ্চিমবাংলাকে উৎসন্নে পাঠায়, যদি বাঙালির ঘরে আবার দেশভাগের সময়ের আগুন লাগে, আবার যদি পোড়ে ঘর—তাতেই বা কী যায় আসে? এবার কোথায় যাবে বাঙালি? অন্য কোথাও যাবে,

নাকি ধর্মত্যাগ করে বেঁচে থাকবে? আগুন কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। এ আগুন সাঁজালের মত অতর্কিতে বা অসাবধানে জ্বলে ওঠা আগুন নয়, এ আগুন লাগানো হচ্ছে ভেবেচিন্তে, সুকৌশলে। কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করছি। এগুলো পড়লে বুঝতে পারবেন কোন্ পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। বুঝতে পারবেন ইসলামী সন্ত্রাস ও অত্যাচার কী দ্রুতগতিতে পশ্চিমবাংলাকে বাঙালি-শূন্য দেশে রূপান্তরিত করছে। আর এই সন্ত্রাসে সহযোগী হচ্ছেন আমাদেরই গণতান্ত্রিক শাসকরা। বিশেষ করে শাসকদের মধ্যে সেই হিন্দু নেতারা যাদের পূর্বপুরুষ মুসলমানদের অত্যাচারে পূর্ব বাংলা ছেড়ে এপারে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন মাত্র কিছু বছর আগে।

প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে সাধারণভাবে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের ওপর যে ধরণের আক্রমণ নেমে এসেছিল, সেই একই ধরণের আক্রমণ আরো সংগঠিতভাবে নেমে এসেছে আজ পশ্চিমবাংলাতেও। দেশ যখন ভাগ হয়েছিল, তখন মুর্শিদাবাদ ছিল একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা, সেই গরিষ্ঠতাও ছিল শতাংশের অতি সামান্য ব্যবধানে। বর্তমানে রাজ্যের তিনটি জেলা—মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে হিন্দুরা সংখ্যালঘু। ২০০১ সালের জনগণনাতেও উত্তর দিনাজপুরে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু ২০১১ সালের জনগণনায় তার পতন ঘটেছে। হিন্দু জনসংখ্যা শতাংশের হিসেবে লক্ষণীয়ভাবে নেমে এসেছে বীরভূমে ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। নদীয়া, হাওড়া, কোচবিহার, উত্তর চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, দক্ষিণ দিনাজপুর, কলকাতা ও বর্ধমানে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটেছে মুসলিম জনসংখ্যায়। একমাত্র বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর দার্জিলিং জেলাতে মুসলিম জনসংখ্যা ১০ শতাংশের নীচে। তার জন্য অবশ্য হিন্দুদের উল্লাসের কারণ নেই। কারণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে বিপুল ফারাক, তাতে অবিলম্বে না হলেও কয়েক বছরের মধ্যে ওই জেলাগুলিতেও হিন্দু-মুসলমানের শতাংশের ফারাক সংকুচিত হবে। দুই সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির তুলনামূলক পরিসংখ্যান দিলে সেটাও বোঝা যাবে। পরিসংখ্যানটি ১৯৮১-১৯৯১—এই দশকের।

জেলা	হিন্দু বৃদ্ধি	মুসলমান বৃদ্ধি
কোচবিহার	১৮·৫১	৩৭·৪৩
জলপাইগুড়ি	২২·৫৪	৪৪·৫৮
দার্জিলিং	২৪·৫০	৫৮·১৮
মেদিনীপুর (অখণ্ড)	১৯·৭৪	৫৩·০৮
বাঁকুড়া	১৪·৩৩	৩৮·৭১
চব্বিশ পরগনা (অখণ্ড)	১৬·৪৯	৩৫·১৫

জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার বজায় থাকলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কোন্ অতল অন্ধকারে যাচ্ছে সেটা অনুমেয়।

লক্ষণীয়, সারা ভারতে মুসলিম জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাধারণ হারকে ছাপিয়ে গেছে পশ্চিমবাংলায় তাদের বৃদ্ধির হার এবং অপরদিকে ভারতের গড় হিন্দু হার বৃদ্ধির বেশ নীচে নেমে গেছে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ থেকে কয়েক লক্ষ হিন্দু প্রতি বছর পশ্চিমবাংলায় আসার পরেও হিন্দু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

কেন হচ্ছে এমন? তার প্রধান কারণ, বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যক মুসলমানের এদেশে চলে আসা। যাদের অনেকে দুই রাষ্ট্রের বাসিন্দা। কলকাতার মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির বড় কারণ বাংলাদেশ গঠনের পর যে দশ লক্ষ বিহারী মুসলমানকে পাকিস্তান নিতে অস্বীকার করেছিল, যারা ঢাকায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মত থাকত, তারা সবাই চলে এসেছে পশ্চিমবাংলাতে। তাদের বর্তমান সংখ্যা বিশ লক্ষের ওপর। কলকাতা ও সন্নিহিত দুই চব্বিশ পরগনা এবং হাওড়ায় এসে ডেরা বেঁধেছে তারা। গত ১৭ই নভেম্বর (২০১৬) রাজ্যসভা সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্যর করা এক প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান যে, ভারতে বর্তমানে ২ কোটিরও বেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী বেআইনিভাবে বসবাস করছে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান-আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশ থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আনা বিলের বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, বাম দলগুলি দাবী জানিয়েছে—এইসব দেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী মুসলিমদেরও ভারতীয় নাগরিকত্ব দিতে হবে। নইলে বিল তারা পাশ করতে দেবে না। বাংলা তথা ভারতকে ইসলামী দেশ না বানানো পর্যন্ত এই দলগুলির কাণ্ডজ্ঞান হবে না—এই বিষয়টি কি বলার অপেক্ষা রাখে?

এভাবে সংখ্যাবৃদ্ধির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবাংলাকে দখল করার চক্রান্ত আমাদের সেকুলার নেতারা বুঝতে পারছেন না কিংবা বুঝতে চাইছেন না। ইতিমধ্যেই হালকাভাবে মুসলমান মুখ্যমন্ত্রীর দাবী উঠেছে। যত দিন যাবে তত এই দাবী জোরালো হবে। সেদিন খুব দূরেও নেই। ১৯৫১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমরা ছিল ১৯·৮৫ শতাংশ। ২০১১ সালে হয়েছে ২৭·০১ শতাংশ। হিন্দু জনসংখ্যা নেমে এসেছে ৮০ শতাংশ থেকে ৭২ শতাংশে।

আমাদের নিশ্চিন্তে নিদ্রামগ্ন সেকুলার বন্ধুরা বলবেন হিন্দু জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে যেতে মুসলমানদের এখনও অনেক বছর লাগবে। ততদিন খাওয়া-ঘুম নষ্ট করার কোনও দরকার নেই। ঠিক কথা। নাতিপুতিরা ঝমেলায় পড়বে ভেবে এই প্রজন্মের হিন্দুর মাথা খারাপ করার দরকার কেন থাকবে? তাদের সমস্যা তারা বুঝবে। তারা হিন্দুধর্মে থাকবে কিনা সে তাদের ব্যাপার। সুমনের ঠাকুর্দা কি জানতেন তাঁর নাতি ধর্ম ত্যাগ করবে?

কিন্তু মুশকিল হয়েছে, মাথা থাকলেই যে মাথাব্যথা হয়! মালদা-মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরে নাহয় হিন্দুরা সংখ্যালঘু, ওখানে প্রেম-ভালবাসা মানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার কিঞ্চিৎ বেশি হবে, এটা ধরেই নেওয়া যায়। ওই তিন জেলায় পশ্চিমবাংলার তথা ভারতের আইন যে খুব একটা কার্যকর নয়—সে ব্যাপারটাও মোটামুটি জানা। কিন্তু বাকি জেলাগুলো? বীরভূমে ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় মুসলিম জনসংখ্যা যথাক্রমে ৩৭·০৬ এবং ২৫·৫৭ শতাংশ। তার মানে হিন্দু জনসংখ্যা শতকরা ষাট ভাগের বেশি। নদীয়া, হাওড়া, কোচবিহার, উত্তর চব্বিশ পরগণা প্রভৃতি জেলায় হিন্দু জনসংখ্যা শতকরা পঁচাত্তর ভাগেরও বেশি। কিন্তু এসব জায়গায় হিন্দুদের কী অবস্থা সেটা ভাবলে ঘুম উড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অন্তত যেসব ঘটনা ঘটছে তা জানার পর সুখনিদ্রায় যেতে পারে একমাত্র নির্বোধ এবং উন্মাদরা। ভোট লালায়িত শাসককূলের নির্লজ্জ তোষণ ও পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে আইনের নির্দেশ অমান্য করে শাসকের নির্দেশ মান্য করে চলার জন্য হিন্দু জনতা আজ যে সমূহ বিপদের সম্মুখীন, সেটা বলার কি কোনও দরকার পড়ে? এই ধরনের বিপদের সঙ্গে হিন্দুর পরিচয় পূর্বপাকিস্তান তথা বাংলাদেশে ইতিপূর্বেই হয়েছে, বর্তমানে তা হচ্ছে স্বভূমি পশ্চিমবাংলাতেও। তফাৎ আছে একজায়গাতে। পূর্ব পাকিস্তানে বা বাংলাদেশে আঘাতটা নেমে এসেছিল মুসলমান শাসকের সহযোগিতা ও প্রশ্রয়ে, আর পশ্চিমবাংলায় আঘাতটা নেমে এসেছে হিন্দু নামধারী কিন্তু চিন্তা-চেতনায় হিন্দু-বিরোধী ইসলাম-প্রেমী শাসকের প্রশ্রয়ে ও সহযোগিতায়।

অনেকের কাছে ওপরের কথাগুলো মনগড়া মনে হতে পারে, কারণ এদেশের বাজারী খবরের কাগজ ও মিডিয়া সম্প্রীতির স্বার্থে এসব খবর প্রচার করে না। সুতরাং এইসব ঘটনা বিরাট সংখ্যক বাঙালির অগোচরেই থেকে যায়। তবু সোশাল মিডিয়া এবং অন্য কিছু পথে কিছু খবর কিছু মানুষের গোচরে আসছে। এইসব খবর থেকে বোঝা যায়, পশ্চিমবাংলা ক্রমশ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাশ্মীরের পথে এগিয়ে চলেছে। কাশ্মীরের পথে বলতে কী বোঝাতে চাইছি, সেটা একটু পরিষ্কার করি। পাকিস্তানের সঙ্গে, জঙ্গীদের সঙ্গে এবং কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (যারা এখন কাশ্মীরের জনতা) সঙ্গে লড়াই করেও জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অঙ্গরাজ্য। অঙ্গরাজ্য বটে, তবে কাশ্মীরের হিন্দুরা সেখান থেকে বিতাড়িত। একই অবস্থা ঘটতে চলেছে পশ্চিমবাংলাতেও। ধরেই নেওয়া যায় যে, ভারত সরকার পশ্চিমবাংলাকে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেবে না, যেভাবেই হোক রাখবে ভারতের মধ্যে। কিন্তু রাখলেও সেটা হবে বাঙালিশূন্য পশ্চিমবাংলা। হিন্দুশূন্য পশ্চিমবাংলা। কারণ, যে আক্রমণ নেমে এসেছে বাঙালির ওপর, তাতে প্রথমে গ্রাম ছেড়ে শহরে আসছে বাঙালি এবং ক্রমশ এই রাজ্যের শহর ছেড়ে চলে যাবে অন্য রাজ্যে। একদিন যেভাবে চলে এসেছিল ওপার বাংলা থেকে, ঠিক সেভাবে। ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। ইতিহাস

থেকে শিক্ষা যারা নেয় না, ভগবানেরও সাধ্য নেই তাদের বাঁচানোর। পশ্চিমবাংলার বাঙালি সেই হতভাগ্য, ইতিহাসের শিক্ষা নিতে অপারগ আত্মবিস্মৃত জাতিগোষ্ঠী।

সিঁদুরে মেঘের ধরণধারণ

প্রাক-দেশভাগ পর্বে পূর্ববাংলা থেকে হিন্দুরা উৎখাত হয়েছিল যেসব অত্যাচারের দরুণ, সেগুলো ছিল এরকম :

(১) হিন্দু মেয়েদের/মহিলাদের ওপর যৌন অত্যাচার।

(২) হিন্দু দেবালয় আক্রমণ, প্রতিমা ভাঙচুর ও ধর্মাচরণে বাধাদান।

(৩) হিন্দুবসতি পুড়িয়ে দেওয়া ও হিন্দু সম্পত্তি দখল করে নেওয়া।

(৪) হিন্দুদের জবরদস্তি ধর্মান্তরিত করা।

(৫) ধর্ম পরিবর্তনে অনিচ্ছুক হিন্দুদের হত্যা করা।

(৬) পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুসলিম দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বদলে তাদের প্রশ্রয় দেওয়া।

(৭) গোমাংসের ধর্মীয় রাজনীতি।

এই কারণগুলির প্রত্যেকটি পূর্ববাংলার হিন্দুদের ওপর অত্যন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ১৯৪১ সালের জনগণনা অনুসারে তৎকালীন পূর্ববাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ। স্বাভাবিক নিয়মে পরবর্তী দশ বছরে এই সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। তা তো হয়ই নি, বরং ১৯৫১ সালের সেনসাস অনুযায়ী শতাংশের বিচারে হিন্দুর সংখ্যা নেমে গিয়ে দাঁড়ায় ২২·৮ শতাংশে। আর ২০১১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী পূর্ববাংলায় বা বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ৮ শতাংশেরও কম। কারণ বিপুল সংখ্যক হিন্দু স্বদেশ ছেলে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে ভারতে। সুসংবদ্ধ কোনও তথ্য পাওয়া না গেলেও একটি পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে কেবলমাত্র ১৯৪৭ থেকে ১৯৬১—এই কয়টি বছরেই পঞ্চাশ লক্ষ হিন্দু ভারতে এসেছে উদ্বাস্তু হয়ে। হিন্দুদের দেশত্যাগের এই পর্ব এই ২০১৬ সালেও সমানে চলেছে। পরিসংখ্যানে আরও বলা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ৪৫ লক্ষ হিন্দুর হিসাব মিলছেনা। অর্থাৎ এই সংখ্যক হিন্দু এদেশেও আসেনি (অর্থাৎ এখানকার জনগণনাতে তারা অনুপস্থিত) আবার ওপারের অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণনাতেও তাদের কোনও হদিশ নেই। সহজ অর্থ হল, তারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবুল করতে বাধ্য হয়েছে।

পূর্ববাংলা বা অধুনা বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা বর্ণনা করে পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি করব না। কারণ, সচেতন পাঠকরা এই ধরণের অত্যাচার সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তার চেয়ে বরং ঘরপোড়ার সেই সব ঘটনা কিভাবে এবং কোন্ চেহারায় ফিরে এসেছে পশ্চিমবাংলাতে—সেটা আলোচনা করি। সিঁদুরে মেঘ যে ভালভাবে দখল করে নিয়েছে বাংলার আকাশ, সেটা বোঝাবার জন্য।

ধর্মনিরপেক্ষ বাম সরকার এবং মমতা সরকারের আমলে কিভাবে এই অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে পশ্চিমবাংলায়, তার কয়েকটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

(এক) হিন্দু মহিলাদের ওপর যৌন অত্যাচার : নদীয়ার ধানতলার ঘটনা হয়তো কারও কারও মনে আছে, যেখানে হিন্দু বরযাত্রীদের বাস থামিয়ে বেশ কিছু মহিলাকে কয়েক ঘণ্টা ধরে গণধর্ষণ করা হয়। নেতৃত্বে ছিল সিপিএমের মুসলিম নেতা কমরেড সহিদুল রহমান। একই বছরে (২০০৩) নভেম্বর মাসে প্রায় একই জায়গাতে হিন্দু বরযাত্রীদের আরও চারটি বাস আটকে মহিলাদের গণধর্ষণ করা হয়। পুলিশ এফ আই আর নেয়নি। এখানেও ধর্ষণের নেতৃত্বে মুসলমান কমরেডরা। কলকাতার কাছেই বানতলায় ইউনিসেফ্ কর্মী অনীতা দেওয়ানকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা এখনও হয়তো অনেকেই ভোলেননি। ১২ জুলাই ২০১০-এ নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার লিচুতলা গ্রামে চৈতালি ঘোষ, সুমিতা ঘোষ এবং সুস্মিতা ঘোষ নামে তিনটি ১৩-১৪ বছরের মেয়েকে একদল মুসলিম যুবক স্কুল থেকে ফেরার পথে অপহরণ করে। গণধর্ষণের পর তাদের অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার ধারে ফেলে রেখে দেয়। হিন্দুরা থানায় যায়, দাবী করে ধর্ষকদের গ্রেফতারি ও শাস্তির। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের পুলিশ ও প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এই ২০১০ সালের এপ্রিল মাসের ১৬ তারিখে ব্যারাকপুর স্পোর্টস্ কমপ্লেক্স-এর মাঠে একদল মুসলিম যুবক মেয়ে খেলোয়াড়দের ওপর যৌন নির্যাতন করে। নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোয় ডলি বিশ্বাস (১৪) এবং পূজা সিং (১৭) নামে দুটি মেয়েকে প্রচণ্ড মারধোর করা হয়। তাদের ভর্তি করতে হয় নার্সিং হোমে। ১০ অক্টোবর ২০০৯ তারিখে চুঁচুড়া শহরের কাছে বাঁশবেড়িয়াতে ২২ বছরের হিন্দু তরুণীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করে তিন মুসলিম যুবক। ২০১০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে চন্দননগরে বাড়িতে ঢুকে অষ্টম শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রীকে ধর্ষণ করে এক মুসলমান যুবক। মেয়েটি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং প্রথমে চুঁচুড়া হাসপাতালে ও পরে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাতে হয় তাকে চিকিৎসার জন্যে। মেয়েটির বাবা পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। থানার দারোগা ব্যক্তিগতভাবে কেস্‌টিতে উৎসাহের সঙ্গে তদন্ত করেন (শোনা যায়, ভদ্রলোক ছাত্রাবস্থায় আর.এস.এস-এর শাখায় যেতেন) ও যুবকটিকে গ্রেফতার করেন। তখন এলাকার সিপিএম নেতারা মেয়েটির বাবার ওপর ৫০ হাজার টাকা নিয়ে ব্যাপারটি মিটিয়ে নিতে চাপ দেন। সেই চাপের কাছে প্রশাসন মাথা নত করে। কোনও শাস্তি হয়নি ধর্ষক যুবকের।

উদাহরণ আরও অনেক। ২০১১ সালের ৮ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার পাতিখালি গ্রামের হতদরিদ্র রাধাকান্ত মণ্ডলের ১৭ বছরের মা-মরা মেয়ে সবিতাকে দুই মুসলিম সইফুদ্দিন মিস্ত্রী এবং পাপ্পু শেখ ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণের পর প্রমাণ লোপাট করতে গলা টিপে খুন করার চেষ্টা করে। কিন্তু সৌভাগ্য কিংবা

দুর্ভাগ্য যাই হোক না মেয়েটি অজ্ঞান হয়েছিল কেবল, মরে যায়নি। প্রতিবেশী হিন্দুরা মেয়েটিকে বাঁচায় এবং পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার ব্যবস্থা করে। ধর্ষকদের সাহায্যে এগিয়ে আসে স্থানীয় সিপিএমের তালেবর নেতা সওকাত মোল্লা। পুলিশ চেপে দিল ঘটনা। ধর্ষকরা বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে এলাকায়। ২০০৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে সন্দেশখালি থানার (উত্তর ২৪ পরগণা জেলা) সরবেড়িয়া পঞ্চায়েতের অধীনে ভাটিদহ গ্রামে মুসলিম যুবকদের দ্বারা গণধর্ষিতা হয় তপশীলী উপজাতি পরিবারের মেয়ে নয়না সরদার। শুধু ধর্ষণ নয়, নয়নাকে অপহরণ করে আটকে রেখেছিল দুর্বৃত্তরা। পুলিশ নিশ্চুপ। স্থানীয় সিপিএম নেতাদের সৌজন্যে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দুষ্কৃতীরা। ২০১০-এর অক্টোবরে বাসন্তী থানার কুমড়াখালি গ্রামে নমিতা ওঝাকে ধর্ষণ করে এক মুসলমান যুবক। অঞ্চল পঞ্চায়েতের মুসলমান প্রধান সবছেল্লা মোল্লার চাপে পুলিশ ঠুঁটো জগন্নাথ-এর ভূমিকা পালন করে।

এরকম উদাহরণ অজস্র। ক'টা আর বলব? কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা তো আগ মার্কা ধর্মনিরপেক্ষ সিপিএমের আমলের। এবার চোখ ফেরানো যাক মমতা-আমলে। এই পুস্তিকায় ইতিপূর্বে লিখেছি, ধর্মনিরপেক্ষতার বাহানায় তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে সিপিএম মুসলমানদের এনে বসিয়েছিল বাড়ির ড্রইংরুমে আর তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ঢুকিয়ে নিয়েছে বেডরুমে। মুসলমান দুষ্কৃতীদের হাতে অমুসলমান মেয়েদের ধর্ষণের ঘটনা তাই এই রাজত্বে কমেনি তো বটেই, বরং বেড়েছে। আরও বড় কথা, পশ্চিমবাংলার ইসলামী মানসিকতায় আজ যেরকম ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে, যেভাবে প্রশাসনকে থোড়াই কেয়ার করার প্রবণতা এসেছে, যেভাবে 'যা খুশি করিনা কেন কেউ আমাকে ছুঁতে পারবে না' এই ধারণাটি দৃঢ়তর হচ্ছে দিনকে দিন, তাতে নির্দ্বিধায় বলা যায় সময়টা বড় ভয়ঙ্কর। বড় বিপজ্জনক। কয়েকটা মাত্র উদাহরণ দেব মমতা জমানার ধর্ষণক্লিষ্ট পশ্চিমবাংলার।

(১) ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ঘটনা। ধর্ষিতা যদিও হিন্দু নন। সুজেট জর্ডান নামে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলাকে চলন্ত গাড়ির মধ্যে ধর্ষণ করে কাদের খান। কাদেরের সহযোগীর ভূমিকায় ছিল রুমান খান, নাসের খান ও মহম্মদ আলি। গাড়িটা ছিল সুমিত বাজাজ নামক এক হিন্দু সন্তানের। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনাকে সাজানো বলেছিলেন। তৃণমূলী সাংসদ কাকলি ঘোষ দোস্তিদার ধর্ষিতা মহিলাকে পণ্যানারী বলেছিলেন। একই কথা বলেছিলেন তৃণমূলের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও অন্যান্যরা। তদন্ত করে ঘটনাটি যে সাজানো নয়, সেটা প্রমাণ করেছিলেন পুলিশ অফিসার দয়মন্তী সেন, যার জন্য ক্রুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে গুরুত্বহীন পদে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।' পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ড নামে কুখ্যাত এই ঘটনা।

(২) ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আর এক ঘটনা। ৩৫ বছর বয়সী হিন্দু

বিধবা তাঁর ১১ বছরের মেয়েকে নিয়ে কাটোয়া-আমেদপুর ট্রেনে যাচ্ছিলেন। ট্রেনের মধ্য থেকে তাঁকে নামিয়ে ধর্ষণ করে আটজন মুসলিম। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এটাকে সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত বলেছিলেন। এই ঘটনার তদন্তে কোনও দয়মন্তী সেন ছিলেন না। সুতারং তদন্তের নামে প্রহসন। উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের অভাবে সব অভিযুক্তকে মুক্তি দেন ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের বিচারপতি কাজী আবদুল হাসান। 'কাটোয়া গণধর্ষণকাণ্ড' নামে এই ঘটনা কুখ্যাত।

(৩) ২০১৩ সালের জুন মাসে কলকাতার কাছেই কামদুনি গ্রামে ২০ বছরের কলেজছাত্রী শিপ্রা ঘোষকে ধর্ষণ ও হত্যা করে যে দুষ্কৃতী দল তাদের অধিকাংশ মুসলমান। নৃশংসতার বিচারে এই ঘটনার জুড়ি নেই। ধর্ষণের পর ধর্ষিতার দুটি পা টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয় নাভি থেকে। 'কামদুনি কাণ্ড' হিসেবে এই ঘটনা সারা ভারতে পরিচিত।

(৪) ২০১৫ সালের জুলাই মাসে বারুইপুরের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) নাবালিকা টুকটুকি মণ্ডলকে অপহরণ করে আটকে রেখে দিনের পর দিন ধর্ষণ করা হয়। সম্প্রীতি রক্ষার জন্য পুলিশ-প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিতে চাইছিল না। পরিশেষে হিন্দু সংহতি নেতা তপন ঘোষ ও ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতাদের চাপে বাধ্য হয়ে টুকটুকিকে মুসলমানদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয়।

(৫) ২০১৬ সালের একেবারে শুরুতে জামুরিয়া গোয়ালপাড়ার দশম শ্রেণির ছাত্রী টুইঙ্কল্ সাউকে (১৫) ধর্ষণের পর খুন করে একটা পরিত্যক্ত কয়লাখনির গহ্বরে (coal pit) মধ্যে ফেলে দেয় আফ্তাব আলম আনসারি ওরফে রাজা নামে এক যুবক। এই ঘটনায় এলাকায় প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। আসানসোলের সাংসদ বিজেপির বাবুল সুপ্রিয় মৃতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁকে মাঝপথে আটকে দেয় পুলিশ।

এবার অতিসাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার কথা আসি। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গোয়ালতোড় থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুরের আদিবাসী মহিলা পডো সোরেনকে ধর্ষণের চেষ্টা করে রাজীব খান নামে মুসলিম যুবক। এই ঘটনায় আদিবাসী সমাজ প্রচণ্ড ক্ষোভে ফেটে পড়ে। মুসলমানরাও তৈরি থাকে প্রত্যাঘাতের জন্য। সংঘর্ষ বেধে যায়। বিশাল পুলিশ বাহিনী গিয়ে ঘটনার সামাল দেয়। অভিযুক্ত যুবককে কিন্তু গ্রেফতার করা হয়নি। ১৪ই অক্টোবর (২০১৬) বীরভূমের মহম্মদ বাজারে দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বাঙালি মেয়েদের শ্লীলতাহানি করতে আসে কিছু মুসলমান যুবক। কিন্তু শোভাযাত্রায় উপস্থিত বাঙালি যুবকদের প্রতিরোধে সফল হয়নি তারা। পরের দিন সেই রাগে অমিত ব্যানার্জী নামে একজনকে বেধড়ক মারধর করে মুসলমানরা। এই ঘটনায় হিন্দুরা প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

তিন বাচ্চার বাপ ইমাম আলি মণ্ডল হিন্দু পরিচয় দিয়ে সম্পর্ক তৈরি করেছিল

নদীয়ার হাঁসখালির গাজনা গ্রামে মৌ রজক নামে ১৮ বছরের মেয়েটির সঙ্গে। মৌ একা নয়, ইমাম এগিয়েছিল মৌ-এর এক বান্ধবীর দিকেও। ইমামের আসল পরিচয় জানার পর মৌ নিজে তো তার সঙ্গে সম্পর্ক কেটে দেয়, তার বান্ধবীকেও সাবধান করে দেয়। সেই রাগে এক রাতে ঘরের মধ্যে ঘুমন্ত মৌ-এর শরীরে নাইট্রিক অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে ইমাম। অ্যাসিডের কিছুটা লাগে পাশে শুয়ে থাকা মৌ-এর মায়ের শরীরেও। দশ দিন ধরে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর হার মানে মৌ। ঘটনা ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসের। উত্তর ২৪ পরগণার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত ভেবিয়া বাজারে ৩০শে সেপ্টেম্বর (২০১৬)-র রাতে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন এক মহিলা। তাঁর কিশোরী মেয়েকে নিয়ে। ইচ্ছাকৃতভাবে সাইকেল দিয়ে ওদের ধাক্কা মারে জনৈক মিন্টু গাজী। মা-মেয়ের শ্লীলতাহানির করে। মহিলা চিৎকার চেঁচামেচি করলে মিন্টু গাজী ঘটনাস্থল থেকে পালায়। কত ঘটনার কথা বলব আর? পশ্চিমবাংলার নগরে-গ্রামে-গঞ্জে প্রতিদিন ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে এরকম ঘটনা। আমাদের বুদ্ধিজীবীরা, সংবাদমাধ্যম, লেখক-শিল্পীরা নিশ্চুপ। সবাই ভাবছে, আমার বাড়িতে তো হয়নি, আমার মেয়ে-বউ তো ভাল আছে। অতএব আমি কেন ঝামেলায় পড়ি? কিন্তু আগুন তো বেছেবেছে বাড়ি পোড়ায় না, আগুন যখন লাগে তখন আশেপাশে যা পায়, তাকে পোড়ায়। এবার এমনই এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার বিবরণ দিয়ে শেষ করব এই প্রসঙ্গটির।

ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট শহরের। এলাকার নামী সিপিএম নেতার একমাত্র মেয়ে একদিন গৃহত্যাগ করল। খোঁজ করতে জানা গেল, শহর থেকে কিছু দূরে এক মুসলিম ছেলের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। মেয়ের বাবা তাঁর এক বন্ধু (বন্ধুটি বসিরহাট মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলর ছিলেন)-কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন সেখানে মেয়েকে বোঝাতে। মেয়ে তার বাবাকে মুখের ওপর বলে দিল—"বাবা, তুমি তো কমিউনিস্ট, তুমি তো শিক্ষা দিয়েছ ধর্ম না মানতে, তাহলে আজ আমাকে হিন্দু-মুসলমান নিয়ে বলতে এসেছ কেন?" মুখ নীচু করে চলে এসেছিলেন নেতা মহোদয়। কিন্তু কাহিনীর শেষেরটুকু বাকি। মাস তিনেকের মধ্যে মেয়ের বাবার কাছে ফোন এল জামাইয়ের। ব্যাঙ্গালোর থেকে। চাকরি করতে সেখানে বউকে নিয়ে এসেছে সে। ফোনে বলল, 'আপনার মেয়ে অসুস্থ, একবার আসুন।' বাবা ছুটলেন। গিয়ে দেখলেন, মেয়ে নেই। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবে বাঁচেনি। খবরে প্রকাশ, একটি সুইসাইড নোট রেখে গিয়েছিল মেয়েটি। সেখানে সে লিখেছে, তার শিক্ষা, তার সংস্কার, তার বিশ্বাস কিভাবে প্রতি পদে ভাঙছিল। এই ভাঙন তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল, সেজন্যই জীবনে ইতি টানার সিদ্ধান্ত।

(দুই) হিন্দুর দেবালয় আক্রমণ, প্রতিমা ভাঙচুর ও ধর্মাচরণে বাধাদান :

ইসলাম শাসিত পূর্ববাংলায় হিন্দুদের সন্ত্রস্ত করা ও ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করার জন্য হিন্দুর দেবালয়ে আক্রণ এবং তাদের ধর্মাচরণে বাধাদান ছিল এক অতি পরিচিত পদ্ধতি। কিন্তু বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত পশ্চিমবাংলাতেও এই পদ্ধতি ক্রমশ কতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তার কয়েকটি উদাহরণ দেব।

প্রথমে বলি, নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী গ্রাম মনসাহাটির তারক ব্রহ্ম হরিনাম সংকীর্তনের কথা। বহু প্রাচীন এই সংকীর্তনের বিরোধিতা করে মুসলমানরা। পুলিশে অভিযোগ দায়ের করে তারা বলে যে, অষ্টপ্রহর হরিনামের সংকীর্তনে 'আজান' পড়তে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ বাম সরকারের পুলিশ এসে ভক্তদের ওপর লাঠিচার্জ করে, ভগবানের জন্য নিবেদিত নৈবেদ্যের থালায় লাথি মারে।

বজবজের চিংড়িপোতার বাসিন্দা প্রশান্ত দাস তাঁর বাড়ির গেটের পাশে বজরংবলীর একটি মূর্তি বসিয়েছিলেন। ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মসজিদে যাওয়া-আসার সময় সেই মূর্তি নজরে পড়ত আর এতে নাকি তাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগত। এই অভিযোগে ২০১০-এর ১৪ই আগস্ট বজবজ থানার দারোগা এলেন মূর্তিটাকে ভাঙতে। এলাকার বিরাট সংখ্যক বিহারী হিন্দুদের প্রতিবাদে পুলিশ অবশ্য শেষপর্যন্ত ভাঙতে পারেনি মূর্তিটিকে, কিন্তু মুসলমানদের ধর্মীয় চাপের কাছে পুলিশ যে কত নপুংসক, সেটা বোঝা যায় এই ঘটনায়। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবাংলার যেখানে যতটুকু প্রতিরোধ তৈরি হচ্ছে, তার বেশিরভাগই বিহারী হিন্দুদের সৌজন্যে। আর বাঙালির? 'মোরা একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' গানটি আরও কত ভালভাবে গাওয়া যায়, সেই অনুশীলনে তারা ব্যস্ত। ২০০৯-এর ১০ জুলাই মুর্শিদাবাদের ঝাউবোনা ও ত্রিমোহনী গ্রামে স্কুলে নমাজ পড়ার দাবী জানায় মুসলমানরা। স্কুলে সরস্বতী পূজা বন্ধ করে দেওয়ার পর নমাজ পড়ার এই দাবীতে গ্রামের হিন্দুরা আপত্তি জানায়। আক্রমণ নেমে আসে হিন্দুদের ওপর। ভেঙে দেওয়া হয় মন্দির। খুন হয় ১৪ জন হিন্দু, আহত ৫০-এর বেশি। লুঠ হয় হিন্দু সম্পত্তি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ২০০৯-এর ৮ জানুয়ারি হাওড়া জেলার চেঙ্গাইলের চক কাশীতে মুসলমানরা ভেঙে দেয় শনি মন্দির ও হনুমানজীর মন্দির। সেইসঙ্গে চলে ব্যাপক লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগ। হিন্দু রমণীদের বলাৎকারের অভিযোগও ওঠে। বাম জমানার শেষদিকে ঘটে যাওয়া 'দেগঙ্গা দাঙ্গা'র কথা হয়তো এখনও কারও কারও মনে আছে। অনুমান করা যায়, কলকাতার কাছে ঘটে যাওয়া এমন বড় মাপের ঘটনাকে বাংলার মিডিয়া প্রচারের যোগ্য মনে করেনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কারণে। বিজেপি এবং অন্য কিছু হিন্দুত্ববাদী সংগঠন না থাকলে ঘটনাটি লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে যেত। ২০১০ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ছিল সেটি। ইফ্‌তারের পর দেগঙ্গার এক মসজিদে জড়ো হয় মুসলমানরা, তারপর দলবদ্ধ হয়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে দিতে হিন্দু বাড়ি, দোকান ভাঙতে শুরু করে। বেশ কিছু হিন্দু আহত হয় তাদের আক্রমণে।

বেড়াচাঁপা থেকে কদম্বগাছি পর্যন্ত এলাকার হিন্দুরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। চারটি বাসে আগুন ধরানো হয়। এবং সেইসঙ্গে দেগঙ্গা-বেড়াচাঁপার মধ্যবর্তী কার্তিকপুরের শনি মন্দির ও দেগঙ্গা বিপ্লবী কলোনীতে স্থিত কালীমন্দিরটি ভাঙা হয়। শুধু মন্দির ভাঙা নয়, মন্দিরের দেব-দেবী মূর্তিকে ভেঙে তার ওপর প্রস্রাব করেও দেওয়া হয়। হিন্দু পাড়ায় ঢুকে মহিলাদের বলাৎকার করা হয়। এমনও অভিযোগ শোনা গেছে যে, ধর্ষণ করলে ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে যেতে পারে এইজন্য হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ না করে তাদের মুখে জবরদস্তি পুরুষাঙ্গ ঠেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। এত বড় আক্রমণের কারণ ছিল দেগঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির সন্নিকটে স্থিত চট্টল পল্লীতে একটি দুর্গাপূজার জায়গার দখল নেওয়া। দখল নিতে চাইছিল মুসলমানরা। পুরো ঘটনার পরিকল্পনা ও তা কার্যকর করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বসিরহাটের সাংসদ জনাব হাজী নুরুল ইসলাম। পরের যে ঘটনার কথা বলছি সেটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানার অন্তর্গত জ্যোতিষপুর গ্রামের। ৩২ বছর ধরে দুর্গাপূজা হত স্থানীয় রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণে। হঠাৎ করে মুসলমানেরা দাবী জানাল সেখানে তারা ঈদ মিলন পালন করবে। ২০০৯ সালের ২১শে অক্টোবর সেখানে যখন নামকীর্তন চলছে, তখন বেশ কয়েকজন মুসলমান এসে বন্ধ করার হুমকি দিল। ২২ তারিখে লক্ষ্মীপুজোর রাতে মন্দির প্রাঙ্গণে লক্ষ্মীপুজোর মণ্ডপে ঢুকে লক্ষ্মীপ্রতিমার হাত ও মাথা ভেঙে নিয়ে চলে গেল। মূল দুষ্কৃতীদের না ধরে পুলিশ কয়েকজন হিন্দুকে ধরে নিয়ে গেল। স্থানীয় নেতা ও আরএসপি মন্ত্রী সুভাষ নস্কর তোতাপাখির মত বললেন, আইন আইনের পথে চলবে। আর মাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করব বাম জমানায় হিন্দুধর্মের উপর ইসলামী তাণ্ডবের উদাহরণ প্রসঙ্গে। এই ঘটনাটিও দেগঙ্গার সন্নিকটে বসিরহাট শহরের অনতিদূর কচুয়া গ্রামের। ৩৩ বছরের পুরনো কালীমন্দির ভেঙে কালীমূর্তিকে উলঙ্গ করে তার দুটি স্তনে হাত দিয়ে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল বিকৃতমনা আক্রমণকারীরা। বসিরহাটের তদানীন্তন সিপিএম বিধায়ক নারায়ণ মুখার্জী ঘটনাটিকে কিছু পাগলের কাণ্ড বলে অভিহিত করেছিলেন এবং মুসলমানদের বাঁচাতে যথোচিত নির্দেশ দিয়েছিলেন পুলিশকে। ঘটনাটি যদি উল্টো হত অর্থাৎ মুসলমানদের প্রার্থনাগৃহ মসজিদে যদি কোনও পাগল হিন্দু প্রস্রাব করত, তাহলে তার প্রতিক্রিয়া কী হত এবং সেই প্রসঙ্গে নারায়ণবাবু কী বলতেন—সেটা আন্দাজ করা দুরূহ নয়। কচুয়া গ্রামের এই ঘটনাটি ঘটেছিল ২০০৯ সালে যখন বাম সরকারের পতন ঘটিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষমতা দখলের পদধ্বনি স্পষ্ট এবং সেই স্পষ্টতার কারণে পশ্চিমবাংলার মুসলিম মানস উদ্ধত ও বেপরোয়া হয়ে উঠতে শুরু করেছে কোমর বেঁধে।

বাম আমলের কথা ছেড়ে আসি তৃণমূল কংগ্রেস জমানায়। পুস্তিকায় স্থানসংকটে সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার কথা অতি সংক্ষেপে বলব।

(১) ১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে ডায়মণ্ডহারবারের (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) সন্নিকটে ১১৭ নং হাইওয়ের পাশের কালীমন্দির আক্রমণ করে ভেঙে দেয় মৌলবাদী মুসলমানরা।

(২) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১—দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট থানার অন্তর্গত মৌখালি গ্রামে শনিদেব ও কালীমাতার মন্দির ভেঙে দেওয়া হয় রাতের অন্ধকারে। কেটে নেওয়া হয় মূর্তির মাথা।

(৩) ২০১৫ সালে হুগলীতে দুর্গাপূজার মণ্ডপ আক্রান্ত হয় ও প্রতিমা ভাঙচুর করা হয়।

(৪) ২০১২ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঘুটিয়ারি শরিফের সন্নিকটে সাতবিনি গ্রামে আক্রান্ত হয় বনবিবি দেবীর মন্দির।

(৫) বীরভূমের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম কাংলাপাহাড়িতে মৌলবাদীদের হুকুমে দুর্গাপুজো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তিন বছর আগে। এবার (২০১৬) কোলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে প্রশাসন বাধ্য হয় পুজোর অনুমতি দিতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুসলিম তুষ্টিকরণের রাজনীতিতে এবার (২০১৬) উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দুর্গাপূজার পরিবেশ। কোনও লিখিত নির্দেশ ছাড়া পুলিশ দিয়ে ও পুলিশের ভয় দেখিয়ে দুর্গপ্রতিমার নিরঞ্জনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপিত হয় যাতে মহরমের তাজিয়া নিয়ে ভালভাবে উৎসব (শোকপালন নয়) পালন করতে পারে মুসলমানরা। সরকারের এহেন বদান্যতায় উল্লসিত মুসলমানরা বাংলার দিকে দিকে আক্রমণ করেছে দুর্গাপূজার মণ্ডপ, দুর্গাপ্রতিমা। বাধা সৃষ্টি করেছে নিরঞ্জনে।

(১) ১২ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে মালদার কলিগ্রামে হিন্দুদের মহল্লা আক্রান্ত হয়। বাড়ি-ঘরদোরে আগুন লাগানো হয়। ১৩ অক্টোবর বাসি মহরমের মিছিলের সময় চলে আর এক দফা আক্রমণ। ১৪ অক্টোবর সংঘর্ষের দায় হিন্দুদের ওপর চাপিয়ে চাঁচল থানার মৌলবাদী দারোগা (আই.সি) তাহিদ আনোয়ার আটজন হিন্দু যুবককে গ্রেফ্‌তার করে ও চালান করে দেয়।

(২) ১২ অক্টোবর (২০১৬) তারিখে মালদার গাজোলে বিসর্জনের সময় আক্রান্ত হয় দুর্গাপ্রতিমা, পুড়িয়ে দেওয়া পূজামণ্ডপ। মুসলিমদের মদত দেন চাঁচলের দারোগা উপরোক্ত তাহিদ আনোয়ার, যিনি ইতিপূর্বে কলিগ্রামের হিন্দু মহিলাদের 'বেশ্যা' বলেছিলেন।

(৩) এই বছরেই (২০১৬) নৈহাটি থানার হাজিনগরে পেপার মিল চৌমাথায় মহরমের সময় আক্রান্ত হয় হিন্দুরা। ভেঙে ও পুড়িয়ে দেওয়া হয় হিন্দু মহল্লা। তৃণমূল কংগ্রেসের দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিধায়ক অর্জুন সিং হিন্দুদের নয়, দাঁড়িয়েছিলেন আক্রমণকারী মুসলমানদের পাশে।

(৪) হাওড়ার সাকরাইল থানার আড়গোর গ্রামে হিন্দু দেবীদের নিয়ে ও বিসর্জনের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী মহিলাদের লক্ষ্য করে তুমুল অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি

ও মন্তব্য করছিল কিছু মুসলমান যুবক। হিন্দুরা প্রতিবাদ করলে পরিস্থিতি গরম হয়, সংঘর্ষ বাধে। মুসলমানরা একজোট হয়ে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করে।

(৫) ১৩.১০.২০১৬ তারিখে স্থানীয় মসজিতে বসে মৌলবাদীরা পরিকল্পনা করে সাঁকরাইলের বেলতলায় স্থিত মন্দিরটিতে আক্রমণের। খবর পেয়ে হিন্দুরা সতর্ক হয়, পাহারার ব্যবস্থা করে। ফলে পরিকল্পনা কার্যকর করা যায়নি।

(৬) ১০.১০.২০১৬ তারিখে দুর্গাপূজার নবমী তিথি ছিল। ওদিন রাত থেকে শুরু করে ১১ এবং ১২ অক্টোবর পর্যন্ত খড়গপুরের গোলবাজারে মৌলবাদীরা আক্রমণ করে হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানঘর। লুঠ হয় শতাধিক হিন্দু সম্পত্তি। পুলিশ-প্রশাসন যথারীতি ছিল মৌলবাদীদের পক্ষে। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হিন্দু প্রতিরোধ শেষপর্যন্ত বিজয়ী হয়। এই ঘটনায় খড়গপুরের বিজেপি বিধায়ক তথা বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন প্রতিরোধী জনতার।

উপরের ঘটনাগুলি ছাড়াও মহরমের মিছিল থেকে দুর্গাপ্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় হামলা হয়েছ পশ্চিমবাংলার বহু জায়গাতে। লোকচক্ষুর সামনে এসেছে যে জায়গাগুলির নাম, তার তালিকা এরকম :

১. মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী থানার ঘোষপাড়া পঞ্চায়েতের অন্তর্গত টলটলি গ্রাম।
২. হুগলি জেলার চন্দরনগর উর্দিবাজারের তেলেনিপাড়া মহল্লা।
৩. পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার কলাবেড়িয়া গ্রাম।
৪. নদীয়া জেলার কালীগঞ্জ থানার বল্লভপাড়া ঘাট হাটখোলা।
৫. মালদা জেলার চাঁচল থানার খবরা গ্রাম।
৬. মালদা জেলার ইংরেজবাজার থানার আড়াপুর গ্রাম।
৭. মালদা জেলার কালিয়াচক থানার ঋষিপাড়া।
৮. বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার রাজুয়া গ্রাম।
৯. বর্ধমান জেলার কাটোয়া।
১০. উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থানার অন্তর্গত খড়িডাঙা গ্রাম।
১১. বীরবূম জেলার মহম্মদবাজার
১২. বীরভূম জেলার কাঁকরতলা থানার বাবুইজোর গ্রাম।
১৩. বীরভূম জেলার মল্লারপুর।

দুর্গাপূজোর পরে কালীপূজাতেও বেশ কিছু জায়গায় হামলা হয়েছে মণ্ডপে, অপবিত্র করা হয়েছে দেবী প্রতিমা, ভাঙচুরও হয়েছে বেশ কিছু জায়গায়। কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছি নীচে :

১. ৯ নভেম্বর ২০১৬ : কালীপ্রতিমার ভাসানের শোভাযাত্রায় মৌলবাদী যুবকদের আক্রমণ; মহিলাদের শ্লীলতাহানি। স্থান—উত্তর ২৪ পরগণার মীনাখাঁ-চৈতল গ্রাম পঞ্চায়েতে অধীনে আমোদপুর গ্রাম।

২. ৪ নভেম্বর ২০১৬ : হুগলী জেলার সিঙ্গুর থানার বলরামবাটী গ্রামের সংলগ্ন গ্রাম রাজারামবাটীতে বিসর্জনের শোভাযাত্রায় 'মাইক বাজানো চলবে না'—মৌলবাদীদের এই ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ।
৩. ৩১ অক্টোবর ২০১৬ : বীরভূম জেলার নলহাটী থানার লোহাপুর গ্রামে কালীপ্রতিমা ভাঙচুর ।
৪. ২২ অক্টোবর ২০১৬ : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাটানগরে কালীপ্রতিমা নির্মাণ শিল্পী শম্ভু দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ১১টি কালীমূর্তির মাথা কেটে নেওয়া হয়। একই এলাকায় দীপাঞ্জন ক্লাবের এবছরের দুর্গামূর্তি ভেঙে দিয়েছিল মুসলমান দুষ্কৃতীরা। লক্ষ্মীপূজোর সময়েও আক্রমণ চালিয়ে বেশ কয়েকিট প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়।

২ নভেম্বর, ২০১৬, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ফলতা সংলগ্ন নূরপুরে কালীপুজোর মণ্ডপে হামলা চালায় ৫০ জনের বেশি মুসলমান যুবক। মণ্ডপে হইচই বাধাবার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করে, দেবী মূর্তির উদ্দেশ্যে অশ্লীল কথা বলতে থাকে। হিন্দুরা তাদের ক্লীবত্ব ছেড়ে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে নামে। ফলে সংঘর্ষ বাধে। এলাকায় এখনও উত্তেজনা। ২ অক্টোবর (২০১৬) উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় দুর্গাপূজার চাঁদা আদায় নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়। পুলিশ চাঁদা তুলতে প্রশাসনিক নিষেধের উল্লেখ করে। যদিও মুসলমান সংখ্যাগুরু জেলা উত্তর দিনাজপুরে ব্যাপকভাবে মহরমের চাঁদা তুলেছে মুসলমানরা। সেখানে কোনও বাধা নেই। এমনকি, চাহিদা মত মহরমের চাঁদা না দেওয়ায় বীরভূমের মল্লারপুরে ইন্দ্রজিত দত্ত নামে এক হিন্দু যুবককে মেরে ফেলা হলেও সম্প্রীতি রক্ষায় ব্যস্ত প্রশাসন কাউকে গ্রেফতার করেনি। যদিও, 'আইন আইনের পথে চলবে' এই আশ্বাস ধারাবাহিকভাবে মেলে মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে। কিন্তু আশ্বাসই সার, ভোটবাক্সের ফায়দার কথা ভেবে কার্যক্ষেত্রে ঠুঁটো জগন্নাথ বর্তমান বাংলার দণ্ডমুণ্ডের বিধাতারা।

অতি সম্প্রতি (ডিসেম্বর ২০১৬) কাটোয়ায় যে সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলটি হল, তার মূলে ছিল স্থানীয় এক কালীমন্দিরকে অপবিত্র করার একটি ঘটনা। রাতের অন্ধকারে মন্দিরের মধ্যে গোরুর একটি তাজা কাটা পা ফেলে দেওয়া হয়। সেই থেকে সূত্রপাত অশান্তির।

পরিশেষে একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গটি শেষ করব। তা হল, এইসব ধারাবাহিক আক্রমণের মুখে কিছুটা হলেও হিন্দুরা তাদের জড়তা কাটিয়ে উঠছে, কমবেশি প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে নামছে—সেটা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এটাই কিঞ্চিৎ আশার কথা। জানিনা এই আশা দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা। হওয়া মুশকিল। কেননা, পুলিশ-প্রশাসনের চরিত্র তো আমাদের অজানা নয়। অজানা নয় হিন্দুর স্বাভাবিক নপুংসক চরিত্রও।

(তিন) হিন্দু বসতি পুড়িয়ে দেওয়া ও হিন্দু সম্পত্তি দখল করে নেওয়া

স্বধর্ম বাঁচাতে পূর্ববাংলা থেকে যে নিষ্ক্রমণপর্ব শুরু হয়েছিল সেই ১৯৪৬-৪৭ সালে, তা আজও অব্যাহত। এখনও প্রতিদিন কিছু না কিছু হিন্দু পালিয়ে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে বাংলাদেশ ছেড়ে পশ্চিমবাংলায়, ভারতে। কিন্তু এখন শুরু হয়েছে আর এক উলটপুরাণ। দেশভাগের সময় যা কল্পনাও করতে পারেননি হিন্দুরা তথা হিন্দুদের নেতারা, সেই অকল্পনীয় কিন্তু অনিবার্য সম্ভাবনাটি ঘোর বাস্তব হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই অনিবার্যতার জন্য দায়ী ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে, সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষার বাহানায় নির্লজ্জ ভোট ব্যাংক রাজনীতি। সমস্যাটা আজ এতই ভয়ংকর আর মর্মদাহী হয়ে উঠেছে যে, গ্রাম-গঞ্জ থেকে ধর্মরক্ষার জন্য, পরিবারের স্ত্রী-কন্যার মানরক্ষার জন্য একের পর এক বাঙালি পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। আর অবশ্যম্ভাবীভাবে তাদের সম্পত্তির দখল চলে যাচ্ছে মুসলমানদের কাছে।

মালদা-মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরে যে মুসলিম জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে ও হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ কমছে, তার একমাত্র কারণ মুসলমানদের অধিক জন্মহার নয়, তার একটা বড় কারণ ওইসব জায়গা থেকে হিন্দুদের শহরাঞ্চলে চলে আসাও। এই চলে আসার ফলে গ্রাম বাংলার জমিজমা, ঘরবাড়ির মালিকানা বর্তাচ্ছে মুসলমানদের ওপর, শুধু ওপরে উল্লেখিত তিনটি মাত্র জেলা নয়, বীরভূম এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যেভাবে মুসলমানরা গ্রামের পর গ্রাম দখল করে নিচ্ছে, তাতে আগামী দশ-পনের বছরের মধ্যে এই দুটি জেলাও মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাবে।

আমার এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়ি ছিল বীরভূমে। একসময় ব্রাহ্মণরা সেই গ্রামের অধিপতি ছিলেন যে শুধু তাই নয়, বাসিন্দাদের বেশিরভাগই ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের পাকাবাড়ি ছিল, বাড়িতে রাধামাধবের মন্দির ছিল। গ্রামের প্রায় প্রতিবাড়িতে মন্দির। এখন সেসব মন্দিরের বেশিরভাগের ভগ্নদশা। বেশিরভাগ বাড়ির মালিক মুসলমানরা। কিছু বাড়ি এখনো বিক্রী করেননি বটে আগেকার মালিকরা, কিন্তু তাঁদের জমিজায়গা সব হাতবদল হয়ে গেছে। বছরে দু চারদিনের জন্য এইসব বাড়িতে মানুষজন আসেন। গ্রামের গন্ধ নেন, তারপর ফিরে যান শহরের দু-তিন কামরার ফ্ল্যাটে।

কলকাতার গায়ে সেঁটে থাকা ভাঙড়, মালঞ্চ থেকে শুরু করে এগিয়ে যান বাসন্তী হাইওয়ে ধরে কিংবা ভেবিয়া-বেড়াচাঁপা-বসিরহাটের দিকে। যে গ্রামেই যান, ক্ষেতে চাষরত চাষীকে জিগ্যেস করার দরকার হবে না, তার চেহারাই বলে দেবে তার ধর্ম। একশ' জনের মধ্যে দশ-বারোটা হিন্দু চাষী যদি পান, তবে ভাববেন, অনেক পেয়েছেন।

উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট শহরের অনতিদূরে পিফা নামে একটি গ্রাম আছে। এখন অবশ্য চেহারায়-চরিত্রে গ্রাম নয়, গঞ্জ হয়েছে। বর্ধিষ্ণু জনপদ। এই গ্রামের মোটা ভূ-সম্পত্তির মালিক এক বাঙালি ভদ্রলোক গ্রাম ছেড়ে শহরে গেছেন বেশ কিছু বছর আগে। কিন্তু জমিজমা বিক্রী করেননি। দুবছর আগে (২০১৪) তিনি সিদ্ধান্ত

নিলেন—আর নয়। ছেলেরা গ্রামে আসতে চায় না, অতএব জমিজমা রেখে কী লাভ? বেচেই দেওয়া যাক। কিন্তু একটাই দাবী তাঁর। জমির দাম হিসেবে দু-দশ লাখ টাকা কম পেলেও কোঈ পরোয়া নেহী, কিন্তু মুসলমানকে তিনি বিক্রী করবেন না জমি। হিন্দু খরিদ্দার আসা শুরু হল। অবশেষে লাখ বিশেক টাকা কম নিয়ে এক হিন্দু সন্তানকে বিক্রী করে দিলেন জমি। সেই জমি মাস চার-পাঁচের মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে গেল মুসলমানের নামে। জানা গেল, আগের হিন্দু খরিদ্দারটিকে ফিট্ করেছিলেন মুসলমান ভদ্রলোক এবং টাকার যোগানও ছিল তাঁর।

এখানে মালিক কলকাতায় ছিলেন বলে জবরদস্তি করার সুযোগ ছিল না, তাই আড়াল রেখে কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান মালিক যদি গ্রামেই থাকেন, তবে? যদি সম্পত্তি তিনি বিক্রী করতে চান, তবে মুসলমানরা ছাড়া ক্রেতা হবে না কেউ। এবং এরকম পরিস্থিতিতে ভয় দেখানোর যতরকম কৌশল থাকে, বাদ থাকেনা কোনওটার।

নিঃশব্দে, লোকচক্ষুর অন্তরালে পশ্চিমবঙ্গের ভূসম্পত্তির এভাবে হাতবদল চলছে। কোনও সংবাদপত্রে তার খবর নেই, কোনও বুদ্ধিজীবী তার খবর রাখেন না, কোনও সাহিত্যিকের রচনায় নেই তার ন্যূনতম আভাস। সবাই স্বনির্মিত ধর্মনিরপেক্ষতার ঘেরাটোপের মধ্যে বসে 'একই বৃন্তে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান' গান গাইছেন। বৃন্তটি যে পোকায় খাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে—সে হুঁশ নেই কারও। তবু কিছু সংবাদ সোশ্যাল মিডিয়া এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর কল্যাণে বেরিয়ে আসছে বাইরে, পৌঁছাচ্ছে মানুষের কাছে। এমন কিছু ঘটনার কথা বলব এবার।

২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখের ঘটনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দীঘি ব্লকের রাধাকান্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 'সাতাশের লাট' গ্রাম। এই গ্রামের বাসিন্দা সুবল মণ্ডলের জমি জবরদখল করতে এল একদল মুসলমান। একদা এই গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল, কিন্তু ক্রমশ বহিরাগত মুসলমানেরা (যাদের একটা বড় অংশ বাংলাদেশী) প্রচুর সংখ্যায় এখানে চলে আসে। সরকারী জমি, বিশেষ করে পি.ডব্লিউ.ডি এবং সেচবিভাগের (ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের) জমি দখল করে বসে যায় তারা। রাস্তার ধারে নয়ানজুলি দখল করেও ঘর তোলে। হিন্দুরা বংশানুক্রমে যে সব জায়গায় বসবাস করে তাদের আশেপাশে থাকা খালি জমি এভাবে দখল করে বাড়ি ঘরদোর তৈরি করার পর্ব শুরু হয়ে যায়। তারপর তারা নজর দেয় হিন্দুদের পুকুরের ও জমিজমার ওপর। পুকুরে মাছ ধরতে শুরু করে তারা—বলে পুকুর নাকি তাদের দখলী জায়গার মধ্যে চলে এসেছে। এছাড়া পুকুরে স্নান করতে আসা হিন্দু মেয়ে বউরা যখন স্নান করে তখন সেখানেও তারা পৌঁছে যায়। নানান অশ্লীল মন্তব্য করে। পুলিশে অভিযোগ করলেও ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের পুলিশ ব্যবস্থা নেয় না।

অগত্যা হিন্দুরা ঠিক করল, অপদার্থ পুলিশের কাছে না গিয়ে নিজেরাই ঠিক করবে কিভাবে বাঁচবে। কলকাতার হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করল

তারা, তৈরি হল প্রতিরোধের পরিকল্পনা। তারক গায়েন নামে একজনের জমি দখল করতে আসা মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষও হল একদিন। জমির লুঠেরারা হার মানল সেদিন।

কিন্তু ডিসেম্বরের ২৯ তারিখে মুসলমানরা অধিক সংখ্যায় আরও তৈরি হয়ে এল। আক্রমণটিও ছিল অতর্কিত। তেমন কোনও প্রতিরোধ করতে পারল না। সুবল মণ্ডল, অমল মণ্ডল, বিজয় মণ্ডল, প্রসেনজিৎ মণ্ডল ও দেবু হালদার মারাত্মকভাবে জখম হল। রায়দীঘি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠাতে হল তাদের। তাদের ঘর ভাঙল, আগুন লাগানো হল। তাদের স্ত্রীদের যথা ভগবতী হালদার, রেনুকা মণ্ডল, অম্বিকা মণ্ডল, পুতুল মণ্ডলদের শ্লীলতাহানি করা হল ও মারধোর করা হল। হাসপাতালে গেল তারাও। ঠুঁটো জগন্নাথ পুলিশ যথারীতি বোবা। লুঠেরাদের একজনকেও গ্রেফ্‌তার করা হয়নি। জানমান বাঁচাতে গ্রামের সংখ্যালঘু হিন্দুদের সামনে এখন একটাই পথ—গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যাওয়া। সেকথাই ভাবতে বাধ্য হচ্ছে তারা।

২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস। ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত শহরের নিকটবর্তী একটি গ্রাম। গ্রামের এক হিন্দুবাড়ির ওপর দিয়ে এক মুসলমান প্রতিবেশী প্রায়ই থালায় কিংবা কোনও পাত্রে করে গোমাংস নিয়ে যায়। বিরক্ত হয়ে একদিন হিন্দুবাড়ির ভদ্রলোকটি বললেন—বাবা, বাড়ির ওপর দিয়ে ওই জিনিষটি না নিয়ে গেলেই কি নয়? তাছাড়া এটা তো তোমার রাস্তাও নয়। উত্তর এল—শর্টকাট হয় এখান দিয়ে গেলে। নতুন তো যাচ্ছি না। হিন্দু ভদ্রলোক এবার গলা চড়ান। বলেন, আমার বাড়ির ওপর দিয়ে আমি যেতে দেব না। ফল হল মারাত্মক। গোরু কাটা শুরু হল পাড়ার ভেতরেই। আগে দু-একজন যেত জায়গাটা দিয়ে, এখন দলে দলে যাওয়া শুরু হল। হিন্দুরা চেষ্টা করল প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের। সংঘর্ষ হল একদিন। পুলিশ এসে ধরল হিন্দুদের। স্থানীয় হিন্দুরা এখন চিন্তা করছে এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়ার।

উত্তর ২৪ পরগনার টাকী শহরের সন্নিকটে তকীপুর গ্রাম। সেখানকার বাসিন্দা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে কর্মরত একজন জানালেন, জমি-জায়গা বিক্রী করে চলে আসা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই সামনে। বাড়ির মেয়েদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। হরিপুর, তকীপুর, দীঘির পাড়, তালপুকুর—আশপাশের সব গ্রামের রাস্তার পাশে যত্রতত্র বিক্রী হচ্ছে গোমাংস। একটু আড়ালে নিয়ে যেতে বললে চোখরাঙানি। পুরো গ্রাম যেন আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গেছে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। এভাবে বাঁচা যায় না। ভদ্রলোক বারাসতের দিকে ফ্ল্যাট খুঁজছেন। একটু মজা করে বললাম, বারাসত নয়, ঝাড়খণ্ডের দিকে বাড়ি তৈরি করাই ভাল। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাঙালির পাট উঠতে খুব বেশি বিলম্ব নেই আর। অতএব ধর্ম বাঁচাতে পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যাওয়াটাই শ্রেয়।

২০১৪ সালের ৪ঠা মে-র ঘটনা। গ্রামের নাম অর্জুনপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ। নাম শুনলেই বোঝা যায় হিন্দুর গ্রাম ছিল একদা। গ্রামের শ্মশানটি ৩০০ বছরের প্রাচীন। শ্মশানের দিকে নজর পড়ল স্থানীয় মৌলবাদীদের। তারা বলল জায়গাটিকে কবরস্থানের জন্য চাই তাদের। শ্মশানে যেন কোনও হিন্দুর দেহ না আসে, তার জন্য ভয় দেখানো শুরু হল। এইরকম সময়ে একদিন গ্রামের বাসিন্দা জীবন পালের মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে এল তার পরিবার-পরিজনরা। মুসলমানরা দল বেঁধে এসে বাধা দিল। মৃতের পরিবার থানায় গেল। অভিযোগ দায়ের করল। পুলিশ-পঞ্চায়েত এল। সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তারা বিধান দিল ১৫ কিলোমিটার দূরবর্তী একটি জায়গায় দাহ করার জন্য। শ্মশানযাত্রীরা অস্বীকার করল। তারপরই শুরু হল আসল খেলা। বোমা পড়ল শ্মশানে। শবযাত্রীরা পালাল। কিন্তু পালালে তো চলবে না। মৃতদেহের সৎকার তো করতেই হবে। অতএব ফিরেও এল কিছু সময় পরে। এসে দেখল, মৃতদেহ গায়েব। অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না। স্থানীয় থানা, জেলা পুলিশ, জেলাশাসক এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে পরিবার। আজ পর্যন্ত পরিবার জানতে পারল না কী হল তাদের প্রিয় মানুষের মৃতদেহের। এতবড় কাণ্ডের কোনও খবর ধর্মনিরপেক্ষ বাংলার কোনও খবরের কাগজ বা টিভিতে দেখতে পাননি। আর এইজন্যে খবরটি সত্যি কিনা খুব স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নটি জাগতে পারে আপনার মধ্যে। এইজন্যে একটা রেফারেন্স দিচ্ছি। স্বচক্ষে দেখে নিন ঘটনাটিকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। লিংক হল : https://www.youtube.com/watch? v = SBkHZOj N10.

হিন্দু সম্পত্তি সরকার দ্বারা অধিগৃহীত হওয়া আবার সেই সরকার দ্বারা মুসলমানের সম্পত্তি রক্ষা করার ঘটনার ফলেও বাঙালি ক্রমশ উৎখাত হচ্ছে জমির মালিকানা থেকে। সিঙ্গুরে এই ঘটনা ঘটেছিল বাম আমলে। খুব কম মুসলমানের জমিতে হাত পড়েছিল সেখানে। The Minority Report : West Bengal Hindus under Siege' নামে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের প্রবলতম ধর্মনিরপেক্ষ রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা কীরকম দ্রুততার সঙ্গে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে তার একটা পরিষ্কার চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে :

"So, what is the state Government, responsible for protecting its citizens, irrespective of their castes and creed, doing? ....Mamata Banerjees' TMC party is only after minority votes. ....it will not really worry about a few Hindus being killed along the way. In fact, West Bengal chief minister is all out to woo Muslims and she can go to any lengths to get votes. **After assuming power, she even recited the KALIMA SHAHADAT, the Islamic conversion**

prayer, in front of an audience of imams to appease Muslims. (জাতি ধর্ম নির্বিশেষে নাগরিকদের রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার তাহলে কী করছে? মমতা ব্যানার্জীর টিএমসি পার্টি কেবলমাত্র সংখ্যালঘু ভোটের দিকে চেয়ে আছে। যদি কিছু হিন্দু এজন্য নিহত হয়, তার জন্য চিন্তা নেই এই সরকারের। মুসলমান ভোট পাওয়ার জন্য পশ্চমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করতে পারেন না, এমন কোনও কাজ নেই। **ক্ষমতায় বসার পর (২০১১ সালে) তিনি ইমামদের এক সভায় ইসলামী পোশাক পরে ইসলামী ভঙ্গিতে 'কলিমা সাহাদাত' যা কিনা অন্যধর্মের মানুষদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করার সময় পাঠ করানো হয়—তা পাঠ করেছিলেন।)**

এই থেকেই অনুমেয় পশ্চিমবাংলার বাঙালি কোথায় আছে এবং কোথায় যাচ্ছে।

চার) বলপূর্বক ধর্মান্তরণ : বিশ্ব মানবাধিকার সংগঠনের হিসাবে পূর্ব বাংলার ৪৫ লক্ষ বাঙালির কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। এরা না এসেছে পশ্চিমবাংলাতে, না তাদের হিসাব আছে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের সেন্সাস রিপোর্টে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনের দৃঢ় বিশ্বাস—এদের বলপূর্বক ধর্মান্তরণে বাধ্য করা হয়েছে। এরা সবাই এখন মুসলমান, আর একজন্যই হিন্দুর হিসাব থেকে তারা বাদ গেছে, যুক্ত হয়েছে মুসলমানের হিসাবে। একই চিত্র পাকিস্তানে। একই চিত্র ছিল আফগানিস্তানেও।

ইসলামী দেশে এভাবে বলপূর্বক ধর্মান্তরণ অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা। হুমায়ুন আজাদ-তসলিমা নাসরিনদের বইতে আছে ধর্মান্তরণ প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ—কিছু আগে খত্না (লিঙ্গত্বক ছেদ) হয়েছে; লুঙ্গি পরে সাবধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন একদা রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বর্তমানে রবিয়ুল হাসান; তাঁরই গোয়াল থেকে নিয়ে গিয়ে জবাই হয়েছে গোরু; মাংস রান্না হচ্ছে; চারদিক সুগন্ধে ম'ম' করছে। মৌলভী স্মরণ করিয়ে দিলেন নমাজের সময় হয়েছে; নমাজ শেষে প্রথম গো-মাংস ভক্ষণ করে আল্লাতালার বান্দা হতে হবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচারকরা এবং এই ব্যাপারের সঙ্গে যাঁদের কিঞ্চিৎমাত্র পরিচয়ও নেই, তারা বলবেন ইসলামী বাংলাদেশ-পাকিস্তানে এইসব ঘটনা একান্তভাবেই বাস্তব, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমবাংলায় বলপূর্বক ধর্মান্তরণ অসম্ভব। হতেই পারে না এমন ঘটনা। সেইসব অবিশ্বাসীদের জানাই, হতে পারে। বহাল তবিয়তে ঘটতে পারে, ঘটছেও। উদাহরণ টানব কোনও আরএসএস বা বিজেপির দেওয়া তথ্য থেকে নয়, American Thinker নামক অনলাইন পত্রিকায় ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৫-তে প্রকাশিত Janet Levy লিখিত The Muslim Takeover of West Bengal নিবন্ধ থেকে একটু অংশ উদ্ধার করছি। কী বলেছেন সেখানে নিবন্ধকার—সেটা দেখা যাক...."while the situation for Hindus in Bangladesh is certainly dire, life has become increasingly difficult for Hindus

in West Bengal, home to a Muslim appeasing government and a breeding ground and safe haven for terrorists." ২০১৩ সালে সংঘটিত ক্যানিংয়ের দাঙ্গা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এই নিবন্ধে—"Muslims in West Bengal were actively lobbying for a second partition of India to create an Islamic super state—Mughalistan that would incorporate Pakistan, Bangladesh and parts of India....Into this charged situation, the murder of a Muslim cleric by unidentified assailants sparked outrage among Muslims as thousands mobilized for rioting. Over 200 Hindu homes were looted and firebombed, hundreds of temples and idols destroyed and vehicles set on fire amid shouts of Allah-hu-Akbar. Repeated calls for help by Hindus went unanswered by the police. ঘটনা ঘটে যাওয়ার কয়েকদিন পরে পুলিশ ব্যবস্থা নিল। ব্যবস্থা মানে হিন্দুদের গ্রেফ্তার। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে কলকাতার উপকণ্ঠে উস্থিতে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে। দুষ্কৃতীদের না ধরে গ্রেফ্তার করা হয়েছে হিন্দুদের। আর এইসব ঘটনার পরিণামে কী হচ্ছে তার বর্ণনা নিবন্ধকার দিয়েছেন এভাবে—"In some areas, such as the border district of Murshidabad which has over 66% Muslim, Islami Shariah law is imposed on all residents (including Hindus)." একই ঘটনা মুসলিম সংখ্যাগুরু মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে। এমন কি বীরভূম (মুসলিম জনসংখ্যা ৩৭·০৬%), দক্ষিণ ২৪ পরগণা (৩৫·৫৭%), নদীয়া (২৬·৭৬%), হাওড়া (২৬·২০%) প্রভৃতি জেলাতেও অঞ্চল বিশেষে শরিয়তী আইন চালু হচ্ছে। সন্ধ্যাবেলায় শাঁখ বাজানো যাবে না, কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করা যাবে না, এমনকি একেবারেই পুজো না করার ফতোয়া পর্যন্ত জারি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে হিন্দু মেয়েকে প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে ধর্মান্তরণে বাধ্য করা। ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু পরিবারগুলোর সামনে একটাই পথ থাকে তখন। আর তা হল, গ্রামের পাট তুলে দিয়ে শহরে চলে আসা। যাদের সে ক্ষমতা থাকে না তারা বাধ্য হয় ধর্ম পরিবর্তন করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গ্রামে থেকে যেতে। আর এভাবেই দিনে দিনে বাড়ছে পশ্চিমবাংলায় মুসলমানের সংখ্যা, কমছে বাঙালির সংখ্যা।

পাঁচ) হিন্দু হত্যার বাড়বাড়ন্ত : ইসলামী মৌলবাদের সামান্যতম বিরোধিতা করলেও তার শাস্তি মৃত্যু। কোথাও কোথাও আবার গলা কাটার ইসলামী নির্দেশ যথাযথভাবে মান্য করে জবাই চলছে। না, এইসব ঘটনা ১৯৪৬ সলের গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের কিংবা নোয়াখালি গণহত্যার সময়ের নয়। এইসব ঘটনা স্বাধীনতা-উত্তর ভারত গণরাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিমবাংলা নামক হতভাগ্য রাজ্যের। উদাহরণ অজস্র আছে, কিন্তু তা দেওয়ার দরকার বোধহয় নেই। তবু নিয়ম রক্ষার্থে

উদ্ধৃত করি কয়েকটি ঘটনার কথা। এতেই আঁচ পাবেন কোথায় চলেছে বংলা, কোথায় চলেছে বাঙালি।

একেবারে সাম্প্রতিক ঘটনা। এই বছরের (২০১৬) অক্টোবর মাসের। চাহিদামত মহরমের চাঁদা না দেওয়ার অপরাধে খুন হন ইন্দ্রজিৎ দত্ত।

'বক্‌রিদে গোরুর কুরবানি দেওয়ার পর আমরা হিন্দুদের কুরবানি দেব' এই ধ্বনি তুলে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঢোলাহাটে মুসলিম জনতা আক্রমণ করে হিন্দু মহল্লা। এই বছরের (২০১৬) সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনা। পুলিশ ফাঁড়িও আক্রমণ করে তারা। জবাই করা হয় এক সাধারণ হিন্দুকে। আহতের সংখ্যা বেশ কয়েকজন।

খড়গপুরের সাম্প্রতিক (১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬) ঘটনা। রোহিত তাঁতি নামে এক কিশোর সাইকেলে আসার সময় ধাক্কা লাগে একটি মুসলিম মেয়ের সঙ্গে। এই অপরাধে মুসলিমদের এক জনতা পিটিয়ে মেরে ফেলে তাকে। এই ঘটনায় রাগে ফেটে পড়ে দলমত নির্বিশেষে এলাকার হিন্দু যুবকেরা। এমন কি তৃণমূল কংগ্রেসের হিন্দু যুবকেরাও হাত মেলায় বিজেপি দলের স্থানীয় বিধায়ক দিলীপ ঘোষের সঙ্গে। সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয় ইসলামী আক্রমণ থেকে হিন্দুদের বাঁচাবার প্রচেষ্টায়। কিন্তু পুলিশ? প্রশাসন? প্রশাসনের নির্দেশে সাধারণ জামিনযোগ্য ধারায় কেস দেওয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশের দস্তুর।

নদীয়া জেলার জুড়ানপুর গ্রামে ২০১৫ সালের ঘটনা। মুসলমানদের হাতে নিহত হয় মারু হাজরা, রসময় হাজরা, ময়না হাজরা এবং শান্তি হাজরা।

২০১৬ সালের মে মাসের ঘটনা। ঘটনাস্থল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা। অসমর্থিত সূত্র অনুযায়ী জানা গেছে, কমপক্ষে দুজন হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে।

হিন্দুস্তান টাইমসের একটি রিপোর্ট অনুসারে সারা দেশে ২০১৩ সালে মুসলমানদের হাতে ৪১ জন হিন্দুর মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা প্রায় এক-চতুর্থাংশ। বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে এই সংখ্যা। আরও বাড়ত, যদি না মৃত্যুর আসল কারণটিকে চেপে দিত পুলিশ। পার্ক সার্কাসের মুসলিম ছেলে রিজওয়ানুর রহমানের মৃত্যু নিয়ে বাংলায় যে উথালপাতাল কাণ্ড ঘটেছিল, আশা করি, সেকথা অনেকেই এখনও ভোলেন নি। এদেশের বুদ্ধিজীবীরা, সংবাদপত্র-মিডিয়ার লোকজন একেবারে কেঁদে ভাসিয়েছিলেন রিজওয়ানুরের জন্য। আত্মহত্যার তত্ত্ব কিংবা দুর্ঘটনায় মৃত্যুর তত্ত্ব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যে তত্ত্বটি সামনে আনা হয়েছিল সেটি হল, প্রিয়াংকা টোডি নামের এক মাড়োয়ারি হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করার অপরাধেই নাকি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মেরেছে মুসলিম যুবকটিকে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বাম সরকারের মুখে মুসলমানরা নুড়ো জেলে দিয়ে চলে যাওয়ার যে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তার জন্য অনেকটা দায়ী ছিল এই ঘটনা। সবাই হায় হায় করে উঠেছিল।

এর একটা উল্টো দিকও যে আছে, তা অবশ্য দেখেও দেখেননি এই 'হায় হায়' করনেওয়ালারা। হিন্দু ছেলে মুসলিম মেয়ের সঙ্গে প্রেম বা বিয়ে করলে তার ভবিতব্য যে আরও ভয়ংকর পদ্ধতির শিকার হয়ে মরে যাওয়া—এই তথ্যটি কি কোনও টিভিতে বা সংবাদপত্রে দেখেছেন কেউ? বাজি রেখে বলতে পারি—না। দেখেননি। এরকম কিছু ঘটনার উল্লেখ করছি এখানে :

(১) মুম্বাইতে চাকুরিরত শৈলেন্দ্রপ্রসাদ বিয়ে করেছিল সেখানে পরিচারিকা হিসেবে কর্মরতা মুর্শিদাবাদের মনেরা খাতুনকে। তাদের একটি পুত্রসন্তানও হয়েছিল। ২০০৮ সালে মনেরা কয়েকদিনের জন্য আসে বাপের বাড়িতে। বউকে নিয়ে যেতে আসে শৈলেন্দ্রপ্রসাদও। নিজের ধর্মের কথা কাউকে বলেনি সে, পরিচয় দিয়েছিল মুসলমান হিসেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ধরা পড়ে যায়। পরিণামে একেবারে ধর্মসিদ্ধ পথে ধড় থেকে তার মুণ্ডটাকে আলাদা করে গ্রামের পাটক্ষেতে পুঁতে দেওয়া হয়।

(২) নদীয়ার শান্তিপুরের চঞ্চল সাধুখাঁ বিয়ে করেছিল স্থানীয় একটি মুসলমান মেয়েকে। সেই অপরাধে মেয়ের বাবা লোকলস্কর নিয়ে আক্রমণ করে চঞ্চলের বাড়ি। চঞ্চল জানত, এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। তাই পালিয়ে গিয়েছিল বউকে নিয়ে। কিন্তু তারপর যা ঘটেছিল, তা তার ধারণায় ছিল না। চঞ্চলকে না পেয়ে তার ৬০ বৎসর বয়স্ক বাবা রাধানাথ সাধুখাঁর মাথায় পিস্তলের গুলি করে হত্যা করা হয়।

(৩) বাঙালির ছেলে, থাকত বিহারের হাজীপুরে। নাম সঞ্জীব। বিয়ে করেছিল মহম্মদ আজাজুলের মেয়েকে। এই অপরাধে শতাধিক মুসলমানের এক উন্মত্ত জনতা সঞ্জীবকে ও তার ভাইকে প্রচণ্ড মারধোর করে। তারপর সঞ্জীব ও তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে চলে যায়। পরদিন স্ত্রীর গ্রামের গাছে পাওয়া যায় সঞ্জীবের মৃতদেহ।

(সূত্র : Hindu Man Brutally Murdered : www.opindia.com)

(৪) ২০১২ সালে ২২ বছরের হিন্দু যুবক দীপঙ্কর রায়কে নৃশংসভাবে খুন করে মুসলমানরা। দীপঙ্করের অপরাধ, সে স্থানীয় একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছিল। (সত্র : ঐ)

হোয়াটস অ্যাপ, টুইটার, ফেসবুক ইত্যাদি সোশ্যাল মিডিয়াতে হিন্দু যুবকদের এবং কোথাও কোথাও তার মুসলিম বধূদের হত্যার খবর মাঝেমধ্যেই আপনার নজরে পড়বে। হয়তো সব ঘটনা সত্যি না-ও হতে পারে, তবু এইসব ঘটনা কেউ যদি বিশ্বাস করে, তাকে দোষ দেওয়া যায়না। কেননা, দেশের নামীদামী সংবাদপত্র ও তাদের প্রথিতযশা সাংবাদিককূল সেইসঙ্গে দেশের সুশীল সমাজের কাছে হিন্দুর জীবনের কোনও দাম নেই। দেশে অনেক হিন্দু আছে, তার মধ্যে থেকে দু-পাঁচটা মরে গেলে শতাংশের বিচারে তেমন কোনও ফারাক ঘটে না—এইজন্যেই বোধহয়। কিন্তু মুসলমানের জীবন নিয়ে তাঁরা বড় চিন্তিত। এইজন্যেই উত্তরপ্রদেশে একটা আখলাক

আমেদকে বাড়িতে গোমাংস রাখার দোষে উন্মত্ত জনতা হত্যা করলে মুখ্যস্রোতের সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের কান্নার শেষ থাকে না, পূর্বতন জমানার সরকারী স্নেহধন্য ও প্রসাদধন্য শিল্পী-কুলফিদের পদক ফিরিয়ে দেওয়ার ধূম পড়ে যায়। (এই ভিড়ে আমাদের বাংলার হাফ-কবি টবিরা যারা লবি করে পুরস্কার যোগাড় করেছেন, তাঁদেরও কেউ কেউ আছেন) অথচ এরাই হাওড়ার পিলখানা ধূলাগড়, বীরভূমের মল্লারপুর, কাটোয়ায় মুসলমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্পত্তি, নিহত হিন্দুদের জন্য একটি বাক্যও ব্যয় না করে নির্লজ্জ সঙ-এর মতো বসে থাকে। বাংলার গ্রামে গ্রামে মৌলবাদী তাণ্ডবে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত হিন্দুদের সম্পর্কে এদের মুখে কুলুপ। ভণ্ডামির যে একটা সীমা আছে, সেটাও এঁরা ভুলে গেছেন।

প্রশাসনের প্রশ্রয় : বাংলায় এখন ইসলামী রাজ চলছে। ব্রিটিশ শাসন অধিষ্ঠিত হওয়ার পর বাঙালি মুক্তি পেয়েছিল ইসলামী কুশাসন থেকে। বাংলার ধর্ম-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য-জীবনচর্যায় এসেছিল সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ। তাই নবজন্ম ঘটেছিল বাঙালির। কিন্তু দেশভাগের পর থেকে সংখ্যালঘু স্বার্থরক্ষার বাহানায় ধ্বংসের পথে যাত্রা শুরু করেছে বাঙালি এবং এই পথে এগিয়েও এসেছে অনেকটা পথ। শেষের ঘণ্টা বাজার খুব বেশি দেরি আর নেই বলে মনে হয়, যদি না ব্যাপক কোনও পরিবর্তন আসে বাংলায়। পরিবর্তন মানে হিন্দুদের প্রতি শাসকের মানসিকতার পরিবর্তন। মুসলিম তুষ্টিকরণের রাজনীতির অবসান ঘটানোর শাসকীয় পরিবর্তন। আসামে এই পরিবর্তন অবশেষে এসেছে। বাংলায় কি তা আসবে? বড়ই কষ্টকল্পনা।

এই পুস্তিকায় ইতিপূর্বে দেখিয়েছি, কিভাবে স্বদেশে পরদেশী হতে চলেছে বাঙালি। কিভাবে বাঙালি জীবনে ফিরে এসেছে প্রাক-ব্রিটিশ সুলতান যুগের মুসলিম শাসনের সেইসব ভয়াবহ অধ্যায়। ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতির দিকে তাকাতে গিয়ে একটা জাতিকে কিভাবে আত্মহননের দিকে ঠেলে দিয়েছে ধারাবাহিকভাবে বাঙলার শাসকরা, সেই লজ্জা ও গ্লানির বিচার একদিন হয়তো করবে দূরবর্তী ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে উঠে দাঁড়াবার জন্য সেদিন না-ও থাকতে পারে বাঙালি জাতি। শিল্প-সাহিত্য-দর্শনের পীঠস্থান রোমান জাতি ধ্বংস হয়েছে, এই জাতির কোনও নামগন্ধ আজ নেই। বাঙালির ভবিতব্যও এগিয়ে চলেছে সেদিকে।

ছন্দের গুরু সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'আমরা বাঙালি' কবিতায় বর্ণনা করেছেন বাঙালির অতীত গৌরব। বলেছেন "আমরা হেলায় সাপেরে নাচাই, সাপেরই মাথায় নাচি।" আজ বাঙালি সাপকে নাচায় না, সাপের মাথায় নাচে না, আজ বাঙালির মাথায় উঠে গেছে সাপের বিষ। 'কী সাপে দংশিল রে' বলে চিৎকার করার বোধটুকুও আর নেই বাঙালির। বিষজর্জর শরীর—তবু বুঝতে পারছে না মৃত্যু শিয়রে।

এর দায় বাঙালির নিজের। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রদের একান্ত অনুরক্ত পাঠক বাঙালিরা মনে রাখে না যে, এই সব প্রণম্য মানুষরা শুধু বিশ্বপ্রেমের

বার্তা ছড়াননি, বাঙালির উদ্দেশে সাবধানবাণীও দিয়ে গিয়েছেন। জাতির অস্মিতা রক্ষা করতে কী করণীয় বলে গেছেন সেই বিষয়েও। কী বলেছেন তাঁরা, তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছে এখানে—

"প্রশান্ত মহাসাগর হতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় পাঁচশত বছর ধরে পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম"—স্বামী বিবেকানন্দ

—বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দানভেদ-দণ্ডনীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবনযাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। (স্বামী বিবেকানন্দ—Rousing call to HIndu Nation)

—"ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে, ঢোক গিলে কথা কয়, ছেঁড়ান্যাতা, সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাতচড়ে কথা কয় না, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ।....দেশসুদ্ধ কতই হরি বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেই না আজ হাজার বৎসর। শুনবেই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষইশোনে না, তা ভগবান! (স্বামী বিবেকানন্দ : পূর্বোক্ত)

—"....যদি মুসলমান মারে আমরা পড়ে পড়ে মার খাই, তবে জানব, এ সম্ভব করেছে শুধু আমাদের দুর্বলতা....আমরা প্রতিবেশীর কাছে আপীল করতে পারি 'তোমরা ক্রুর হয়ো না, তোমরা ভাল হও, নরহত্যার উপরে কোন ধর্মের ভিত্তি হতে পারেনা'—কিন্তু সে আপীল যে দুর্বলের কান্না।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৬)

—"বস্তুত মুসলমান যদি কখনও বলে হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে ছলনা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। ....হিন্দু-মুসলমান মিলন একটি গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গালভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে না।" (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শরৎ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৭৩)

—"ইসলাম ধর্মীরা কোরানের দুইটি আয়াত 'পৌত্তলিকদের যেখানে পাও হত্যা কর' এবং 'অতএব ধর্মযুদ্ধে তাদের বন্দী করে হয় বশ্যতার অঙ্গীকার নতুবা মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দাও' অনুযায়ী ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলে যে, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাসী পৌত্তলিকদের হত্যা বা নির্যাতন করা ঈশ্বরের নির্দেশ এবং আবশ্যিক। সুতরাং ইসলাম ধর্মীদের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং ঈশ্বরের নির্দেশ পালনে অত্যুৎসাহিতা সেই পৌত্তলিকগণকে হত্যা ও নির্যাতন করতে একালে বা সেকালে কখনই বিরত হয় নাই।" (রাজা রামমোহন রায়। সূত্র : তুহফাৎ-উল-মুওয়াহিদ্দীন, রামমোহন স্মরণ, মার্চ ১৯৮৯, পরিশিষ্ট, পৃ.-৩১ এবং নূসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা রচিত 'ইসলামী শাস্তি ও বিধর্মী সংহার' গ্রন্থ, পৃষ্ঠা-৪০)

ছয়) নিদ্রামগ্ন পুলিশ-প্রশাসন : ষাটের দশকে কমিউনিস্টদের খুব প্রিয় একটা শ্লোগান ছিল—'পুলিশ তুমি যতই মারো, মাইনে তোমার একশ' বারো।' তখন দেশের সঙ্গে এই বাংলাতেও কংগ্রেস রাজ। ক্রমশ ধ্বসে যেতে থাকল কংগ্রেসের ভিত। দু-দুটো যুক্তফ্রন্ট রাজত্ব পেরিয়ে সাতাত্তর সালে পশ্চিমবাংলার ক্ষমতা গেল বামফ্রন্টের বকলমে সিপিএমের হাতে। এবং ক্ষমতা পেয়েই বামেরা সর্বপ্রথমে খেয়ে নিল যে বস্তুটি, সেটা হল পুলিশ-প্রশাসন। চৌত্রিশ বছর ধরে কানুনকে দেরাজবন্দী করে নেতাবাক্যই বেদবাক্য এই নির্দেশ দিয়ে রাজ্যটাকে চালাল তারা। ২০১১-তে যখন বিদায় নিল, তখন আইনের পিণ্ডদান হয়ে গেছে। সিপিএম পুলিশ রাতারাতি তৃণমূল পুলিশ। আগের মতোই চলতে থাকা। শুধু 'বাবু' পাল্টাল। আর কিছু নয়। শহর-বন্দর-গাঁ গঞ্জের ক্রিমিনালরা—যারা সিপিএম করত, পুলিশের সঙ্গে ওঠাবসা করত, তারা জার্সি পাল্টে তৃণমূল হল। সুবিধা হল পুলিশের, নতুন করে পরিচয়-টরিচয় করতে হল না। এক্কেবারে বাম-জমানার ফটো কপি। শুধু জার্সি আর বুকনিটা যা পাল্টাল। আগে 'লাল সেলাম' বললে সাতখুন মাফ, এখন সে জায়গায় ঘাসফুল জিন্দাবাদ।

এক পুলিশ অফিসার কথায় কথায় জানালেন, নির্দেশ আছে—মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে হুট্‌হাট্ করে এফ আই আর নেওয়া যাবে না, চার্জশীটে কড়া ধারা দেওয়া যাবে না। একেবারে এড়ানো না গেলে দিতে পারো বটে, তবে অভিমন্যু হওয়া চলবে না, বেরিয়ে আসার রাস্তা বা Exit Route টা রাখা চাই, যাতে সেই পথে বেরিয়ে আসতে পারে বেচারারা। গ্রেফ্‌তারের সংখ্যা আর সাজাপ্রাপ্তের সংখ্যার বিশাল ব্যবধানটা দেখলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝবেন।

এই যে ক'দিন আগে (ডিসেম্বর ২০১৬) ধূলাগড়, বাসুদেবপুর, কাটোয়া, মল্লারপুরে এত কাণ্ড হল, হাজারের ওপর ঘরবাড়ি পুড়ল, সাম্প্রদায়িকতার চূড়ান্ত হল—মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিল পুলিশ? এককথায় উত্তর—কিচ্ছু না। একটা বড়ো শূন্য।

এরকম নির্দেশ যে সরকার দিয়েছে, সেটা গোলমাল পাকানোওয়ালারা ভালোমতনই জানে। তাই তারা ভয়হীন, বেপরোয়া।

সাত) গোমাংসের রাজনীতি : বাঙালির একটা বড়ো অংশ এখনও সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য বা সিপিএম ত্যাগী তৃণমূল নেতা কবি সুবোধ সরকারের মতো গোমাংস প্রিয় হয়ে উঠতে পারেননি। এখনো এই বস্তুটি দেখাতেও তাঁদের বড় অনীহা। বড় পাপবোধ। বাসে-ট্রামে এমন অনেক পুরুষ-মহিলাকে দেখবেন যাঁরা রাজাবাজার এলাকায় চোখ বুঁজে থাকেন বা দৃষ্টি রাখেন এমন দিকে যেখানে লোহার শলাকা বিদ্ধ হয়ে ঝুলতে থাকা গোমাংসের বড় বড় টুকরো তাঁদের না দেখতে হয়। এর কারণ, গোরুকে কয়েক সহস্র বছর ধরে পুজো করে এসেছে হিন্দুরা। হিন্দুর এই মানসিকতাকে সপ্তম শতাব্দী থেকে মুসলিম আক্রমণকারীরা তাদের স্বার্থপূরণে

ব্যবহার করে এসেছে। আক্রমণ করার সময় সৈন্যদলের সামনে রেখেছে হাজার হাজার গোরু, যাতে বিরুদ্ধের হিন্দু সৈন্যরা অস্ত্র ব্যবহার না করে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকে। এখন যুদ্ধবিগ্রহে গোরু ব্যবহার চলে না, কিন্তু গোমাংসের ব্যবহার বিপুলভাবে শুরু হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে বিশ-পঁচিশ বছর আগেও যেখানে গোমাংস বিক্রী সাধারণের নজরে পড়ত না, আজ সেসব জায়গায় এটি পরিচিত দৃশ্য। রাস্তার ধারে সর্বত্র দেদার কাটা হচ্ছে গোরু, দেদার বিক্রী হচ্ছে তার মাংস। এই রাজ্যে 'The West Bengal Animal Slaughter Control Act, 1950' নামে একটা আইন আছে। এই আইনে ১৪ বছরের কম বয়সী গোরুকে কাটা যায় না, দুগ্ধবতী গোরুকে কাটা যায় না, নির্দিষ্ট কিছু জায়গার বাইরে অন্য কোথাও গোহত্যা করা যায় না। সরকারি পুরসভার হেল্‌থ অফিসারের অনুমোদন ছাড়া গোহত্যা করা যায় না—এরকম বেশ কিছু নির্দেশ আছে। সেসব নির্দেশ শিকেয় তুলে যত্রতত্র যে কোনও বয়সের গোরু কাটা হচ্ছে। আর গোমাংসের প্রতি এই প্রীতির মাধ্যমে সন্ত্রস্ত করা হচ্ছে হিন্দুকে।

কিন্তু কেন? এই 'কেন' টাই হচ্ছে প্রশ্ন। এটা একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অঙ্গ। একটা বিকৃত আনন্দের মানসিকতা। এর মধ্য দিয়ে একটা কথা বলতে চাওয়া—'দ্যাখ্, যাকে তোরা মা বলিস, তাকে কেমন খাচ্ছি আমরা। কিছু করতে পারবি তোরা? এখন তোদের মা-কে খাচ্ছি, দুদিন পর খাব তোদের।'

পশ্চিমবাংলায় গোমাংস না খেলে যাদের দিন চলে না, তারা কিন্তু উত্তরভারত, পশ্চিম ভারত, কেরালা ছাড়া পুরো দক্ষিণভারতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর গোমাংস না খেয়েই বেঁচে থাকে। কিভাবে থাকে?

বিশ্বপ্রেমিক বাঙালি, উদার মানসিকতার নামে স্বধর্ম বিদ্বেষী বাঙালি মনে রাখেনি এসব কথা। যদি রাখত, তাহলে দেশভাগের পাশবিক স্মৃতি ভুলে গিয়ে এত তাড়াতাড়ি বাংলাটাকে দাঁড় করিয়ে দিত না আর একবার খণ্ডিত হওয়ার মুখে। এমনভাবে পরাধীন করে দিত না নিজেদের। বাঙালি আত্মসচেতন হলে জ্যোতি বসু থেকে শুরু করে মমতা ব্যানার্জী—মুসলিম তুষ্টিকরণের মসীহাগণ বাংলাকে এমনভাবে চালিত করতে পারতেন না বিপুল এক অন্ধকার গহ্বরের দিকে, একের পর এক নির্বাচনে জিতে চালিয়ে যেতে পারতেন না এই রাজ্যটিকে ধ্বংস করার আত্মঘাতী খেলা। জানি, নির্বাচন জিততে তাঁরা ব্যবহার করেছেন পেশী শক্তি, ব্যবহার করেছেন বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভোটবাক্স দখল করার কলাকৌশল, তবু মানুষ যদি বিরুদ্ধে যায় কোনও কৌশলই জিততে পারে না। বাঙালির ধর্মবিনাশকারী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারও কি পতন আটকাতে পারবে? যত তাড়াতাড়ি হয় সেটা, তত মঙ্গল। মনে রাখতে হবে, মরে যাওয়ার পর কোনও ওষুধই কাজ করে না। মরে যাওয়ার আগে বাঙালি কি জাগবে শেষবারের মত?

বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। কারণ, জাতিটার নাম বাঙালি। কারণ, ঘরপোড়া হওয়ার পরেও সিঁদুরে মেঘ দেখে সে সাবধান হয়নি, পতঙ্গের মত রঙ্গে ধেয়ে গেছে আগুনের

দিকে। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অবধারিত মৃত্যুকে বরণ করে নিতে। এই মৃত্যু সাহসীর নয়, এই মৃত্যু কাপুরুষের। এই মৃত্যু অবিমৃষ্যকারীর। এই মৃত্যু ধর্মদ্রোহীর, এই মৃত্যু জাতিদ্রোহীর।

বল হরি—হরিবোল

আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে বাংলায় একটা রাজনৈতিক দল ছিল, নাম ছিল 'আমরা বাঙালি'। রাজনৈতিক দল বটে, তবে যতদূর মনে পড়ছে, নির্বাচনের রাজনীতিতে তেমনভাবে অংশ নিত না। বছরে দু-একবার পদযাত্রা করত কলকাতা থেকে বনগাঁ সীমান্ত পর্যন্ত। অন্য দু-একজায়গাতেও করত। শ্লোগান দিত সীমান্তের বেড়া ভেঙে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কিছুটা অংশ দখল করার। দখল যে করতে পারেনি, সেটা বলাই বাহুল্য। তবু লোকজন জুটিয়ে মিছিলগুলো মন্দ করত না। মিছিল করা ছাড়া আর একটা কাজ তারা খুব করত। রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মের গায়ে, সরকারি অফিসের ফাঁকা দেয়ালে যেখানে জায়গা পেত, খুব শ্লোগান লিখত। একটা শ্লোগানের কথা মনে পড়ছে—'বাঙালি জাগো'। রসিক কোনও বঙ্গসন্তান তার নীচে লিখে দিয়েছিল—'কাঁচা ঘুম ভাঙিও না।'

প্রথম যেদিন পড়েছিলাম এই মন্তব্যটি, খুব হেসেছিলাম। পরে দেখলাম, মন্তব্যটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। যেখানেই বাঙালি জাগো—সেখানেই কাঁচা ঘুম ভাঙিও না। এখন বুঝতে পারছি, হালকা চালে কী নিদারুণ সত্যি কথাটি লিখেছিলেন অজ্ঞাত মন্তব্যকারী! বাঙালির ঘুম সেদিন ভাঙেনি, আজও ভাঙেনি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই জাতটা চারপাইয়ে উঠে রজনীগন্ধার মালা গলায় জড়িয়ে যাবে শ্মশান যাত্রায়। বল হরি, হরিবোল।

—কে যাচ্ছে?

—বাঙালি।

—কী হয়েছিল?

—সেকুলার রোগ।

—সেটা আবার কী রোগ?

—এই রোগে রোগী নিজেই নিজের মাথা হাঁড়িকাঠে তুলে দেয়। মাথা চলে গেলে জীবনটাই যে যাবে, এই রোগ হলে সেই ভয়টা আর থাকে না।

—সাংঘাতিক রোগ দেখছি! এই রোগের লক্ষণ কী, ভাই?

—এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ—ভুলে-যাওয়া। কালকেই ঘরে আগুন লেগেছে, আজ কিস্যু মনে নেই। বউকে-বোনকে টেনে নিয়ে গিয়ে কাল যে লোকটা রেপ্ করেছে, আজ তাকেই ভাই বলে বুকে টেনে নিচ্ছে!

—বলছেন কী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ডাক্তারি শাস্ত্রে এই রোগের নাম হয়েছে বাঙালি রোগ। ভালোই হল। পৃথিবী থেকে চলে গেল জাতটা, কিন্তু চিকিৎসা জগতে অন্তত নামটা রেখে গেল। এটাও বোধ হয় কম কথা নয়। রোগের বিবরণ পড়ার সময় আগামী প্রজন্মের মানুষ জানতে পারবে যে, একদা বাঙালি নামে একটা জাত ছিল। তারা খুব ভাল কবিতা লিখত, গল্প-উপন্যাস লিখত, গান গাইত, ভাষণ মারত। গাদা গাদা মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে। সারা ভারতে বড় নাম ছিল তাদের। বলা হোত, বাঙালি আজ যা ভাবে, বাকী ভারত সেকথা ভাবে আগামীকাল।

—খুব জ্ঞানী ছিল তাহলে!

—জ্ঞানী নয়, মহাজ্ঞানী। তবে কাণ্ডজ্ঞানী ছিল না। নিজের ভাল বুঝত না। আর মরলও তার জন্যে। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে 'আমাদের এই ছিল আমাদের সেই ছিল' বলে স্রেফ্ ঢেকুর তুলে দিন কাটাত না, বদহজমের রুগি হয়ে শুয়ে শুয়ে চিম্‌সে মেরে যেত না। নজর ঘুরিয়ে দেখত, কোন্ পথে সে চলেছে। কোন্ রোগ তাকে ধরেছে। সেই অনুযায়ী ওষুধের ব্যবস্থাটা অন্তত করতে পারত। বাঁচুক না বাঁচুক, বাঁচার চেষ্টাটা করতে পারত।

—বড় দুঃখের কথা। দুনিয়া এমন এক মহাজ্ঞানী জাতকে হারাল! আহারে!

—মহাজ্ঞানী এবং মহামূর্খ। টু ইন ওয়ান। ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে সাবধানী হয়ে বাঁচল, আর ঘরপোড়া বাঙালি আগুন আবার ধেয়ে আসছে দেখেও বাঁচার ব্যবস্থা না করে গান গাইতে বসল 'মোরা একই বৃন্তের দুইটি কুসুম'। মরণ ছাড়া অন্য গতি হয় কখনো? এরা গোরুর চেয়ে বোকা; গোরুরও অধম।

—বড় দুঃখ হল। এমন একটা জাত—হা হা হা রে—

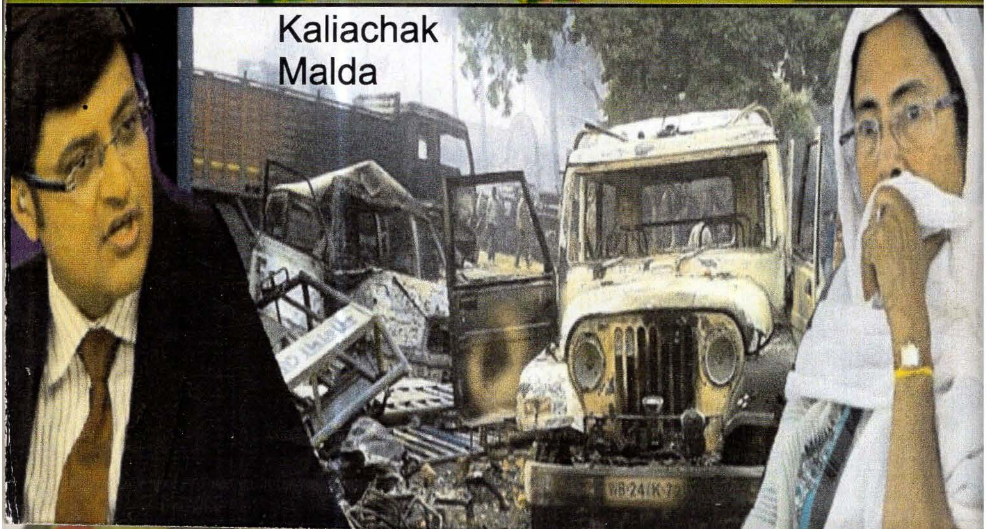
—হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার মতো যে জাত মিউজিয়ামে চলে গেছে—তার জন্যে হাহুতাশ করে কী হবে? সে তো ফিরবে না আর। তার চেয়ে একবার প্রার্থনা করুন—যাতে হতভাগার আত্মার সদ্‌গতি হয়।

—তাই করি তাহলে। বড়ো কষ্ট পেয়েছে বেচারা। বলো হরি, হরিবোল। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ।

তথ্যপঞ্জী :

(১) ইসলামী শাস্তি ও বিধর্মী সংহার : নূসরাত জাহান আয়েশা সিদ্দিকা (জয়শ্রী আচার্য)
(২) স্বামীজীর হিন্দু রাষ্ট্রচিন্তা : সংকলক : শ্রী একনাথ রানাডে
(৩) কেন উদ্বাস্তু হতে হল : শ্রী দেবজ্যোতি রায়
(৪) পশ্চিমবঙ্গ কি বৃহত্তর বাংলাদেশের অঙ্গীভূত হতে চলেছে? : শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
(৫) স্বদেশ সংহতি সংবাদ : সম্পাদক—তপন কুমার ঘোষ
(৬) যুগশঙ্খ (বাংলা দৈনিক) : মুখ্য সম্পাদক—বিজয়কৃষ্ণ নাথ
(৭) নিঃশব্দ সন্ত্রাস : রবীন্দ্রনাথ দত্ত। এবং অন্যান্য।


ATER ISLAMIC BANGLADESH
BHUTAN
THIMPHU
EPAL
INDIA
বৃহত্তর ইসলামী বাংলাদেশ
Greater Islamic Bangladesh
BANGLADESH
NDIA
MYANMAR
(BURMA)
DHAKA
Kolkata
(Calcutta)
GIB
GREATER ISLAMIC BANGLA
A PART OF
MUGHALSTA


Kaliachak
Malda